নয় ভূতের গল্প
ছয় ভূতের গল্প

সঞ্জয়কুমার মুখোপাধ্যায়

ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দ্যেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অপ্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যান্ডস কে - যারা আমাকে এডিট করা নানা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পারেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন - *subhajit819@gmail.com.*

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance

SUBHAJIT KUNDU

নয় ভূতের গল্প

ছয় ভূতের গল্প

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

সুচেতনা

গোচারণ ❖ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

NOI BHUTER GALPO : CHHOI BHUTER GALPO
A Collection of Short Story
By Sanjoy Mukhopadhyay

প্রথম প্রকাশ ঃ মহাষষ্ঠী, আশ্বিন ১৪১৫
First Edition : October 2008

প্রকাশক সুচেতনা
রাজগড়া সাহিত্য-সংস্কৃতি চক্র
গোচারণ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

● গ্রন্থস্বত্ত্ব ঃ জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবির স্রষ্টা ঃ হৃষিকেশ ঘরামি
অলংকরণ ঃ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান ঃ মণ্ডল এণ্ড কোং
৮২, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কল-১২
✆ ৯৯০৩৫৪৮৯৯৩,
সুচেতনা
গোচারণ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা
✆ ০৩২১৮-২৪৩১১৫
✆ ৯৪৩৩৬০৭৬১৩

অক্ষর বিন্যাস ঃ গ্রাফিক পয়েন্ট, কলকাতা - ৯
মুদ্রণ - সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা প্রেস, কলকাতা - ৯

বিনিময় - ৭০ টাকা মাত্র
Price : Rs. 70.00 only

উৎসর্গ

যিনি প্রস্তুতি দেখলেন, প্রকাশ দেখতে পেলেন না

আমার সদ্য প্রয়াতা মা

স্বর্গীয়া সুধারাণী মুখোপাধ্যায়কে

ভূমিকা

ভূত-এর গল্প সংকলনের ভূমিকা লিখতে হবে, ভাবলে ভয় হয়। কারণ, ভূত কোন ভূমিকার তোয়াক্কা করে বলে মনে হয় না। সে সরাসরি গল্পের শরীরে ভর করে পাঠককে 'ভয়' উপহার দিতে ভালবাসে। সঞ্জয়বাবুর ভূতেরা অবশ্য এই চেনা ছকের বাইরে দাপিয়ে বেড়িয়ে আনন্দ পায়। আনন্দ দেয়। তাঁর ভূতেরা অদতে 'ভূত' না মনের বিভ্রান্তি তা ভাবতে চাইলে মন আনন্দে ভরে ওঠে। 'ভয়' আপনা থেকে উঠে পালায়। আকাশী আনন্দ আর সাদা হাসি হাত ধরাধরি করে দোলখায় ছোট-বড় সব পাঠকের মনের দোলনায়।

স্বার্থক ভূতের গল্প যে পরিবেশ-নির্মাণ দাবী করে, সেই নির্মাণ কাজে লেখকের মুন্সীয়ানা পাঠককে অবাক করবে। শিশু-কিশোর সাহিত্যের ভাল বই-এর এই নিদারুন অভাবের দিনে আলোচ্য বইটি ছোট-বড় সবাইকে আনন্দ দেবে, সন্দেহ নেই। সময় শাসিত সরকারী চাকরির কর্তব্য পালনের পর, লেখকের সৃজনসত্তা যেভাবে শিশু-কিশোরদের মনের কথা ভেবেছে—অনুভব করছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

সুকান্ত রায়
প্রাক্তন সম্পাদক এবং বর্তমান
প্রধান উপদেষ্টা
'সুচেতনা'

প্রসঙ্গক্রমে

ভূত আছে কি নেই—এ তর্ক বহুদিন আগেও যেমন ছিল অনেকদিন পরেও হয়তো তেমনই থাকবে। আসলে, আছে বা নেই মত প্রতিষ্ঠার মত প্রমাণ বা উপাদান যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে ততদিন এ তর্ক চলবেই। গলার শিরা ফুলিয়ে চেঁচিয়ে বা টেবিল চাপড়ে বক্তৃতা করে কিম্বা আতঙ্কিত মুখে কাহিনী শুনিয়ে, কোন মতই প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

তবে ভূত থাক আর নাই থাক, ভৌতিক সাহিত্য প্রায় সব ভাষাতেই ছিল আছে থাকবে। বাংলা ভাষায় অন্যান্য সব বিভাগের মত ভৌতিক সাহিত্যও যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী, কী পরিমানে, কী গুণমানে। তবু সেই বৈচিত্র্যের মাঝে আরো কিছু বৈচিত্র্য যোগ করতে আমার এই ছোট্ট প্রয়াস।

'নয় ভূতের গল্প ছয় ভূতের গল্প' বইটা দুটো পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে অর্থাৎ 'নয় ভূতের গল্প' পর্বে নয় কথাটা দ্বার্থক। নয় যেমন সংখ্যা বাচক, অর্থাৎ এই পর্বে নটা গল্প আছে। তেমনই 'নয়' নঞর্থক অর্থাৎ গল্পগুলো পড়ে প্রথমে ভৌতিক বা অলৌকিক মনে হলেও শেষকালে দেখা যাবে ঘটনার পেছনে ভূতের কোন হাত নেই বা অলৌকিক কোনো ব্যাপার নেই। পরের পর্ব অর্থাৎ 'ছয় ভূতের গল্প' পর্বে ছটা গল্প আছে। গল্প গুলোতে ভূত সত্যি সত্যি এসেছে তবে ভূতেদের যথা সম্ভব গতানুগতিকতা বাদ দিয়ে নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেছি।

গল্প গুলোর কয়েকটা সুচেতনা, দেবযান, ইচ্ছে ডানা, প্রভাত সূর্য্য প্রভৃতি নানা পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, কিছু চাপা পড়েছিল পুরনো খাতাপত্রে, কিছু নতুন করে লেখা। এইসব গল্প এক জায়গায় করে প্রেস পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে সুচেতনা সাহিত্য গোষ্ঠীর প্রত্যেকের যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। তবুও আলাদা করে মদনদা (শ্রীমদনমোহন মাহাতা) আর গৌতমের (শ্রী গৌতম মণ্ডল) নাম করতেই হয়, কারণ শুরু থেকে শেষপর্যন্ত এদের অশেষ সাহায্য না পেলে এই বই প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। আর শ্রদ্ধেয় সুকান্ত রায় মহাশয় তার অমূল্য সময় খরচ

করে ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। এদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। সবশেষে বলি, ভূতের গল্প যারা ভালোবাসে তারা যদি এই বই পড়ে আনন্দ পায় তাহলে আমার সব কষ্ট সার্থক মনে করব।

ইতি
সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

গোচারণ
আশ্বিন ১৪১৫

সূচীপত্র (প্রথমপর্ব)

নয় ভূতের গল্প...

এক		অদ্ভুত ভূত ডাব	পৃষ্ঠা	৯
দুই		প্রতিশোধ	পৃষ্ঠা	১৩
তিন		স্বশরীরে	পৃষ্ঠা	১৯
চার		কল্পলোক	পৃষ্ঠা	২২
পাঁচ		গোপনব্যথা	পৃষ্ঠা	৩১
ছয়		অমরলোক	পৃষ্ঠা	৩৯
সাত		আতঙ্ক	পৃষ্ঠা	৪৪
আট		ভূবন হাইতের ভূত	পৃষ্ঠা	৫২
নয়		ভূতের ডেরায় প্রিন্স	পৃষ্ঠা	৫৮

সারাদিন ঝিম ঝিম বৃষ্টির পর সন্ধ্যের মুখে আকাশটা একটু পরিস্কার হতেই বাবলুরা ভিড় জমিয়েছিল পাড়ার ক্লাব ঘরে। অলস দিনের পর একটু আড্ডা মেরে দেহ-মনের জড়তা ছাড়াতে। কিন্তু আড্ডাটাও ঠিক জমছিল না। কারেন্ট নেই, তাই ক্যারাম বা তাসের আসর বসেনি। অবশ্য কারেন্ট থাকলে যে বসত তাও বলা যায় না। যে হারে এখানে ওখানে জল পড়ছে— ক্লাব ঘরের চালটা এবার না সারালেই নয়। ঘরের পশ্চিম দিকটা মোটামুটি শুকনো, গুলতানিটা জমে ছিল ওদিকেই। সকলের টার্গেট ভীতু অমূল্য— ওকে জানলার ধারে বসাতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল সকলে। আসলে পশ্চিমের জানলার ওপাশেই তো কুঞ্জ-বাগান। যে বাগানে সন্ধ্যের পর যেতে অনেক সাহসী লোকেরও বুক কাঁপে। তার ওপর আজকের আবহাওয়া বাগানটাকে আরো রহস্যময় করে তুলেছিল।

অফিস ফেরৎ নিমাই যখন ক্লাব ঘরে ঢুকলো, তখন অমূল্যর দু'হাত ধরে কুচো আর হরি রীতিমত টানাটানি করছে। নিমাই হরির দিকে ফিরে

ধমক লাগায়, 'এই, কী হচ্ছে রে?' অমূল্য কাঁচু মাঁচু মুখে বলে, 'দেখনা আমায় জোর করে ঐ জানলার ধারে বসিয়ে দিচ্ছে।' নিমাই হেসে বলে, 'বেশ করেছে। তোর যদি এত ভয় তো সন্ধ্যের পর বাড়ি থেকে বার হোস কেন?' তারপর কুচোর দিকে ফিরে বলে, 'তোদের বুঝি খুব সাহস? কুঞ্জ বাগানে একবার ঘুরে আয় দেখি কেমন বুকের পাটা?' হরি আর কুচো কুঁকড়ে যায়। বাবলু পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ে, 'তুমি পারবে?' নিমাই কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, 'পুরো বাগান ঘুরে আসব, বল কী খাওয়াবি?' নিমাইয়ের কথায় সকলে একটু থমকে যায়। কুচো পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ে, 'রাত দশটায় চরের শ্মশানে যেতে পারবে? পঁচিশটা রসগোল্লা খাওয়াবো।' 'চরের শ্মশান' নামটা শুনেই অমূল্য 'ইক' করে একটা আওয়াজ করে। বাকি সবাই কোন আওয়াজ না করলেও মনে মনে শিহরিত হয়। কুঞ্জ বাগানের পাশ দিয়ে রাস্তাটা গেছে আধ কিলোমিটার দূরের শ্মশানের দিকে। দিনের বেলায় সে রাস্তায় হাঁটতে গা ছম ছম করে।

নিমাই গলা খাদে নামিয়ে কুচোর দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, 'চ্যালেঞ্জ একসেপ্টেড। আমি যাব। তবে একটা কথা, আমি কিন্তু সঙ্গে সোর্ড নেব। কেউ যদি বাঁদরামি করে ভয় দেখাতে যাও সোর্ডের এককোপে শেষ হবে কিন্তু। তখন আমায় দোষ দিও না। আগে থেকে বলে রাখলাম।' কুচো জিজ্ঞেস করে, 'আজই যাবে তো?'

— যে দিন বলবি।

— আজই ভালো। সবাই ঠিক রাত দশটায় এই ক্লাব ঘরেই জড়ো হব।

রাত দশটায় কুচো, বাবলু, অমূল্য, বুড়োরা জড়ো হয় ক্লাব ঘরে। নিমাই আসে সকলের শেষে। তার এক হাতে আড়াই ফুট লম্বা সোর্ড অন্যহাতে তিন ব্যাটারির টর্চ। নিমাই যাত্রা শুরু করতে যেতেই বুড়ো বলে, তুমি শ্মশান পর্যন্ত গিয়েছ কিনা জানব কী করে?

— বল, কী প্রমাণ নিয়ে আসব? শ্মশানের পোড়া কাঠ?

কুচো খানিক চিন্তা করে বলে, 'জবা ফুল।' এ রাস্তায় কোন জবাফুলের গাছ নেই। আছে সেই শ্মশানের কালীমন্দিরের পাশে। নিমাই বলে, 'সেই ভালো'।

নিমাই এগিয়ে চলে। হাত দুই চওড়া রাস্তাটা অব্যবহারে আগাছায় ভরে উঠেছে। বৃষ্টির জল পেয়ে ব্যাঙ আর ঝিঁঝিঁ পোকারা পাল্লা দিয়ে গলা সাধছে। টর্চের আলোর বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা রহস্যময় জগৎ। হঠাৎ বৃষ্টিভেজা কলাপাতা দেখে দৃষ্টি ভ্রম। নিমাইয়ের বুকটা টিপ্ টিপ্ করে। একবার মনে করে ফিরে যাই দরকার নেই রসগোল্লায়। পরমুহূর্তে জেদ চাপে, 'হেরে যাব?'

শির শির করে বাতাস বয়, গাছের পাতায় জমে থাকা বৃষ্টির জল টুপ টাপ ঝরে পড়ে চমকে দিয়ে যায়। একটু দূরে কোথাও শিয়াল ডেকে ওঠে— নিমাই থমকে দাঁড়ায়। কুঞ্জ বাগানের পর রাস্তাটা গোঁৎ খেয়ে ডানদিকে ঘুরেছে। এবার দূরে নদীর চরটা দেখা যায়। আরে! ওখানে কে যেন সাদা কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে না! নিমাইয়ের নাড়ীর গতি বাড়ছে। না না ওটাতো গাছপালা ঢাকা যাত্রী-চালার সাদা দেওয়াল। আবার এক ঝলক হাওয়া বয়ে যায়, ডানদিকের নারকেল গাছের পাতাগুলো খড় খড় আওয়াজ করে এপাশ ওপাশ দুলে উঠলো। একটা পাখি কর্কশ স্বরে ডেকে উঠলো ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ। বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো। আর ঠিক তখনি নিমাইয়ের হাত চারেক দূরে ধপ্ করে কী যেন পড়ল, নারকেল পাতায় সড় সড় আওয়াজ তুলে। নিমাইয়ের সারা শরীর কেঁপে ওঠে। কাঁপা হাতেই শব্দ লক্ষ করে টর্চের আলো ফেলে। কী-ওটা? একটা ডাব বলে মনে হচ্ছে। সাহস ফিরে আসে, আবার পা'বাড়ায়। কিন্তু ও কী!! এক পা এগোতেই ডাবটাও যেন খানিকটা সরে গেল। নিমাইয়ের গলা শুকিয়ে ওঠে, হাতের টর্চ কাঁপতে থাকে— তবুও আর এক পা এগোয়। না চোখের ভুল নয়, আবার ডাবটা সরে গেল। নিমাইয়ের সর্বাঙ্গ কাঁপছে থর থর করে। সোর্ডটা মাথার ওপর তুলে দৌড়ে দু'পা এগিয়ে সজোরে কোপ মারে ডাবের গায়ে। শিহরিত হয়ে লক্ষ করে ডাব থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বার হয়ে সোর্ডটা লাল হয়ে উঠলো।

নিমাই একবার ডাবের দিকে তাকায় একবার সোর্ডের গায়ে লেগে থাকা রক্তের দিকে তাকায়। এক হাতে টর্চ অন্য হাতে সোর্ড দুটোই কাঁপতে থাকে। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে হাঁটু দু'টো। আচ্ছন্নের মত, অবিন্যস্ত পায়ে দু'পা পিছিয়ে আসে, কিন্তু ছুটে পালাবার শক্তি দেহে নেই। ডাবটা কি এখনো নড়ছে? নাকি টর্চের আলো কাঁপছে বলে অমন মনে হচ্ছে। হঠাৎ কাঁপা গলা সপ্তমে চড়িয়ে চিৎকার করে, 'কুচো-বাবলু-হরি-ছুটে আয় ভূত মেরেছি।'

বাবলুরা ক্লাব ঘরে বসে পশ্চিমের জানলা দিয়ে নিমাইয়ের টর্চের আলোর গতি লক্ষ করছিল। কুঞ্জ বাগান পেরিয়ে যাওয়ার পরেও মাঝে মাঝে গাছ গাছালির ফাঁকে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছিল। বাবলু ঠাট্টা করে কুচোকে বলছিল, 'নিমাইদার যদি কিছু হয়, ওর বাবা কিন্তু তোকে ছাড়বে না।' কুচো কিছু উত্তর দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় রাতের নীরবতা চিরে ভেসে এলো নিমাইয়ের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, 'কুচো....

ওরা ঠিক শুনছে কিনা বোঝার জন্যে কান খাড়া করে থাকে। এবার স্পষ্ট শোনে, বাবলু-হরি ছুটে আয় ভূত মেরেছি।' ওরা চারজন লাঠি আর টর্চ নিয়ে দৌড়োয়। নিমাইয়ের কাছে পৌঁছতে সে উত্তেজিতভাবে বলে, 'ডাব ছুটে পালাচ্ছিল, মারলাম কোপ ডাব থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো।' বাবলুরা নিমাইয়ের বর্ণনা শুনে, সোর্ডের গায়ে লেগে থাকা টাটকা রক্ত দেখে শিহরিত হয়। ওদের হাত-পা কাঁপতে শুরু করে। চার সঙ্গীকে পেয়ে নিমাইয়ের কিছুটা সাহস ফিরে আসে। সে নিজের বিক্রম দেখাতে ডাবটার ওপর আর একবার সজোরে কোপ মারে। সোর্ডের মোক্ষম আঘাতে ডাবটা দ্বিখন্ডিত হয়। ওরা সবিস্ময়ে দেখে ডাবের মধ্যে জলও নয় রক্তও নয়, রয়েছে একটা বিশাল গেছো ইঁদুরের খন্ডিত দেহ!

দেবযান, নভেম্বর ২০০২

ভাগ্নে প্রলয়ের হাত ভেঙেছে। খবরটা রঞ্জনের কাছে মোটেই চমকে ওঠার মত কিছু নয়। ন'বছরের প্রলয় সারাদিন যে প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়ে বেড়ায় তাতে কোন দিন যে হাত, পা ভাঙবে বা মাথা ফাটাবে তা রঞ্জনের জানাই ছিল। কিন্তু মুশকিল হল খবরটা এলো ঘোর দুর্যোগের মধ্যে, তাও রাত দশটায়। ঘটনা ঘটেছে সন্ধ্যে বেলা কিন্তু টেলিফোন লাইনের গোলযোগে খবর পৌঁছল এত রাতে। বোন তো অসহায়ভাবে কেঁদে-কেটে একসা। বলল, 'তোর ভগ্নিপতিও বাড়ি নেই। দিল্লি গেছে অফিসের কাজে। এখনো যোগাযোগ করতে পারি নি। এদিকে ডাক্তারবাবু বলেছেন কাল সকালের মধ্যে অপারেশন করতে হবে।' কান্নায় বোনের গলা বুজে আসছে। একটু সামলে নিয়ে আর্তি জানায়, 'তুই যেভাবে হোক কাল সকালের মধ্যে চলে আয়।'

এখন হাওড়া বা বর্ধমান গিয়ে কোন এক্সপ্রেস ট্রেন পাওয়া মুশকিল আর গেলেও রাত দুটো, আড়াইটে-তে আসানসোল পৌঁছে কোন লাভ হবে না। আবার কাল সকালের গাড়ি ধরলে পৌঁছতে দশটা বেজে যাবে। অনেক

ভেবেচিন্তে রঞ্জন ঠিক করে তেলেণ্ডু থেকে মোকামা প্যাসেঞ্জার ধরে নেবে। সারা রাত ঢুক ঢুক করে গিয়ে কাল একেবারে ভোরবেলাতেই আসানসোল পৌঁছে যাবে।

দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় রঞ্জন। মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। শীতকালে এমন বৃষ্টি বড় একটা দেখা যায় না। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা যেন কামড় বসাচ্ছে সর্বাঙ্গে। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। একবার করুণ চোখে বিছানার দিকে তাকায়। গরম বিছানা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সে ডাক উপেক্ষা করে, একটা ব্যাগে টুকিটাকি জিনিস গুছিয়ে নিয়ে বর্ষাতি-তে সর্বাঙ্গ ঢেকে রাস্তায় নেমে পড়ে। এমনিতে স্টেশন যেতে মিনিট পঁচিশ লাগে। আজ প্রায় একঘন্টা লেগে গেল। পথে একটা কুকুর, বেড়ালও চোখে পড়ে নি। স্টেশনেও জনমানবের কোন চিহ্ন নেই। শুধু ইলেকট্রিক লাইটগুলো ফ্যাকাসে হয়ে জ্বলছে।

এই দারুণ দুর্যোগেও মোকামা প্যাসেঞ্জার ঠিক সময় এসে গেল। রঞ্জনের সামনে যে কামরাটা পড়ল তার আলোগুলো যেন ঝিম মেরে আছে। তা হোক, ট্রেন চললেই আলো বেড়ে যাবে — রঞ্জন আগে অনেকবার দেখেছে। তাই ঐ কামরাতেই উঠে পড়ল। কামরার এমাথা থেকে ওমাথা ঘুরে দেখে একটামাত্র লোক চাদর মুড়ি দিয়ে ওপরের বাঙ্কে শুয়ে আছে, কামরায় দ্বিতীয় কোন লোক নেই। রঞ্জনের গাটা কেমন যেন ছম ছম করে উঠল। ট্রেনটা ততক্ষণে বেশ জোরেই চলতে শুরু করেছে, তবুও আলোগুলো যেমন ঝিমিয়ে ছিল তেমনই ঝিমিয়ে রয়েছে। রঞ্জন মনে মনে চিন্তা করে, পরের স্টেশনে নেমে পাশের কামরায় চলে যাবে। এমন সময় সেই চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা লোকটা পাশ ফেরে। মুখের চাদরটা সরে যায়, আবার চাদরটা টেনে মুখ ঢাকা দেওয়ার ফাঁকে এক ঝলক দেখে নেয় রঞ্জনকে। পরমুহূর্তে আবার মুখের ঢাকা সরিয়ে প্রখর দৃষ্টিতে রঞ্জনের দিকে তাকায়। তারপর ধড়মড় করে উঠে বসে প্রশ্ন করে,—রঞ্জন না?

রঞ্জন লোকটার মুখে নিজের নাম শুনে অবাক হয়। ঐ অল্প আলোতেই নিরীক্ষণ করে লোকটাকে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, তোবড়ানো গাল, মাথার

মাঝখানে চুল প্রায় নেই। খুশি মাখানো বিস্ময়ে হাঁ হয়ে থাকা মুখটার মধ্যে দাঁত আছে কি নেই বোঝা যায় না। কোটরে ঢোকা চোখ দুটো চক্‌চক্‌ করছে। পরনে ডোরাকাটা ফুলসার্টের ওপর হাত কাটা সোয়েটার। রঞ্জন স্মৃতির পাতা উল্টে চলে — নাঃ! এমন কোন মুখ খুঁজে পায় না। তার কোঁচকানো ভুর দিকে তাকিয়ে লোকটা আবার বলে, কিরে চিনতে পারছিস না? অবশ্য তোকে দোষ দেওয়া যায় না। কম দিনের কথা? বছর পঁচিশ তো হবেই। কলেজ ছেড়েছি সেভেন্টি থ্রী-তে, আর তোর সাথে লাস্ট দেখা বোধ হয় সেভেন্টি ফাইভ-এ কি সেভেন্টি সিক্সে—

রঞ্জন কলেজের বন্ধুদের মুখগুলো মনে করার চেষ্টা করে, কিন্তু লাভ হয় না কিছুই। বেশির ভাগ মুখই স্মৃতির এ্যালবাম থেকে মুছে গেছে। লোকটা বলে চলে, তুই কিন্তু বিশেষ বদলাস নি। কলেজ লাইফের যে কেউ তোকে দেখলে অনায়াসে চিনতে পারবে। হঠাৎ লোকটার গলা কেমন যেন কাব্যিক হয়ে যায়। কলেজের দিনগুলো কী ভালই না ছিল। দীর্ঘশ্বাস পড়ে। পরমুহূর্তে খুশিতে উচ্ছল কণ্ঠে বলে, দীপেনের বোনের বিয়েতে যাওয়ার ঘটনা তোর মনে আছে? ওঃ কী ভয়টাই না দেখিয়েছিলি!

রঞ্জনের মনে পড়ে কলেজ থেকে দল বেঁধে দীপেনের গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার কথা। গ্রামের নির্জন পথে শহুরে ছেলে প্রিয়তোষকে ভূতের ভয় দেখিয়ে নাজেহাল করার কথা। রঞ্জন অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করে, তুই প্রিয়তোষ?

— যাক শেষ পর্যন্ত চিনেছিস তাহলে। ওঃ আমায় ভীতু পেয়ে তোরা ক'জনে মিলে যা হেনস্থা করেছিলি সেদিন। আবার বিয়ে বাড়ি পৌঁছে আমার জ্বর পাওয়ার কথা সকলকে বেশ রসিয়ে গল্প করেছিলি। মনে আছে?

রঞ্জনের মুখে, অনেক দিন আগের ঘটনার মজার আভাস নতুন করে পড়ে। প্রিয়তোষের চোখ এড়ায় না, বলে, হাসছিস? প্রথমে ভয়ে পরে লজ্জায় আমার সেদিন কী হাল হয়েছিল তা যদি বুঝতিস।

— ছাড় ওসব কথা। তোর কথা বল। দেখতে তো বেশ উত্তমকুমারের মত ছিলি, চেহারাটা এরকম হল কী করে?

— কঠিন বাস্তবের সাথে লড়তে লড়তে।

— কী করছিস এখন? মানে চাকরি বাকরি?

— না ভাই, সে সৌভাগ্য আমার হয় নি। চাকরি পাই নি দালালি বলিস বা অর্ডার সাপ্লাই বলিস, ঐ করছি আরকি। সব সময় যে সোজা রাস্তায় হাঁটি তাও নয়।

— ঠিক বুঝলাম না।

— এই এখন যেমন এক ডাক্তার বাবুকে একটা জিনিস সাপ্লাই দিতে যাচ্ছি। জিনিসটা পেয়েছি চোরা পথে, পুলিশ তাড়া করলে আমায় ওটার মায়া ত্যাগ করে পালাতে হবে, তখন পুরোটাই লস। কিন্তু ওটা ডাক্তারবাবুকে পৌঁছে দিতে পারলেই মোটা লাভ। আমার কথা ছাড় তোর কথা বল, কী করছিস? বিয়ে থা করেছিস? ছেলেপুলে?

— ওই একটা প্রাইভেট ফার্মে মাঝারি মাপের একটা চাকরি করি। আর যে টুকু জমিজমা আছে চাষবাস করি। বউ-ছেলে নিয়ে মোটামুটি চলে যাচ্ছে কোনরকমে। তুই বিয়ে করিস নি?

— করিনি আবার? বড় ছেলে এবার মাধ্যমিক দেবে। ছোটটা ক্লাস এইট। তা তুই এই দুর্যোগের রাতে এই ট্রেনে কোথায় চলেছিস?

— আর বলিস কেন! গুণধর ভাগ্নে হাত ভেঙেছে তার শুশ্রূষা করতে আসানসোল চলেছি। ভগ্নিপতি অফিসের কাজে বাইরে গেছে, কাজেই — রঞ্জন ব্যাগ থেকে একটা চাদর বার করে গায়ে ঢাকা দিয়ে, ব্যাগটা মাথায় দিয়ে, যেখানে বসেছিল সেখানেই লম্বা হয়ে শুয়ে বলে, একটু ঘুমিয়ে নিই, কাল সারাদিন তো মনে হয় দৌড় ঝাঁপ করতে হবে।

প্রিয়তোষও আবার চাদর টেনে মুখের অর্ধেক ঢাকা দেয়। রহস্যময় কণ্ঠে বলে আচ্ছা রঞ্জন, এমন গা ছমছম করা আবহাওয়ায়, এমন প্রায় অন্ধকার ট্রেনে যেতে তোর একটুও ভয় লাগছে না? তোর সাথে আমার তো প্রায় পঁচিশ বছর কোনো যোগাযোগ নেই। আমার কোন খবর তুই জানিস না। এর মাঝে তো আমি মরে ভূত হয়েও যেতে পারি। রঞ্জনের বুকের মাঝে একটা শির শির কাঁপুনি জাগে। কামরার আলোগুলো প্রায় নিভে

এসেছে। প্রিয়র মুখটা আর দেখা যাচ্ছে না। একটা অন্ধকারের স্তূপের মত তার চাদর ঢাকা দেহটা পড়ে আছে। রঞ্জন উঠে বসে ব্যাগ থেকে জলের বোতল বার করে জল খায়। সেই ফাঁকে একবার প্রিয়র দিকে তাকায়। মনে জোর এনে তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, আমায় ভয় দেখাচ্ছিস? আমি গ্রামের ছেলে, অত সহজে ভয় পাই না। প্রিয়তোষ ফিস ফিস করে একটু হাসল যেন। রঞ্জন বলে আর হাসতে হবে না। যদি ঘুমিয়ে পড়ি দয়া করে আসানসোল এলে ডেকে দিস।

সারা দিনের ক্লান্তিতে রঞ্জনের দেহ অবসন্ন হয়েই ছিল, তার ওপর এমন আবহাওয়ায় ঘুম আসতে দেরী হয় না। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ গায়ের চাদরটা ধরে কে যেন টানল। রঞ্জন ধড়মড় করে উঠে বসে দেখে প্রিয়র একটা চাদর জড়ানো হাত ব্যাঙ্কের পাশে ঝুলছে আর সেই হাতে রঞ্জনের চাদরের একটা খুঁট ধরা। রঞ্জন হ্যাচকা টানে ওর হাত থেকে চাদরটা ছাড়িয়ে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়, গাড়ি আসানসোল ঢুকছে। দ্রুত হাতে চাদরটা পাট করতে করতে অনুযোগের সুরে বলে, ও আবার কেমন ধরনের ডাকা? মুখে আওয়াজ করে ডাকা যায় না? চাদরটা ব্যাগে ঢোকাতে গিয়ে দেখে ব্যাগ নেই। অন্ধকারে সিটের আশেপাশে হাতড়ায়। না: কোথাও নেই। রঞ্জন উঠে দাড়িয়ে প্রিয়র দিকে তাকায়। মাথা মুখ ঢেকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। রঞ্জন চিৎকার করে, এই প্রিয় আমার ব্যাগ কী হল? কোন উত্তর পায় না। জানলা দিয়ে বাইরের চলন্ত আলো এসে পড়ে, প্রিয়র হাতটা এখনো ঝুলেই রয়েছে আর গাড়ির দুলুনির সাথে দোল খাচ্ছে। রঞ্জনের গায়ে কাঁটা দেয়। প্রিয়র কালকের কথাগুলো মনে পড়ে, আমি তো মরে ভূত হয়েও যেতে পারি! দেহের সব শক্তি এক করে প্রিয়র গায়ের চাদরটা ধরে টান দেয়। গাড়ি তখন স্টেশনে ঢুকে পড়েছে প্লাটপর্মের আলো এসে পড়ে প্রিয়র গায়ে। রঞ্জন লাফিয়ে এক পা সরে আসে। একটা নরকঙ্কাল শুয়ে আছে। সব দাঁত বাক করে যেন কালকের মত ফিসফিস করে হাসছে। ট্রেনটা ততক্ষণে থেমে গেছে। রঞ্জন পিছু হটতে হটতে দরজার দিকে যেতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তার ব্যাগটা পড়ে আছে দরজার সামনে। কোন

রকমে ব্যাগের হ্যান্ডেলটা ধরে ঝাঁপ দেয় প্ল্যাটফর্মে। স্পষ্ট শুনতে পায় অন্ধকার কামরা থেকে প্রিয়র অট্টহাসি ভেসে আসছে।

পিছনে তাকাতে তাকাতে, প্রায় ছুটতে ছুটতেই বোনের বাড়ি পৌঁছে যায়। তখনো দেহের কাঁপুনি থামেনি। বোন রঞ্জনের ফ্যাকাসে মুখ দেখে প্রশ্ন করে, কী হয়েছে রে দাদা তোর মুখ চোখ অমন লাগছে কেন? রঞ্জন ঘাড় ঘুরিয়ে আর একবার পিছন দিকে তাকায় তারপর সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে একটা সোফায় ধপাস করে বসে বলে, এক গ্লাস জল দে তো।

বোন জল আনতে ভিতরে যায়। রঞ্জনের হঠাৎ মনে হয় ব্যাগের জিনিস সব ঠিক আছে তো? টাকা-কড়ি কিছু ছিল, এক সেট নতুন জামা প্যান্ট -। তাড়াতাড়ি ব্যাগের চেনটা খোলে। প্রথমেই চোখে পড়ে একটা চারপাট করা কাগজ। ভাঁজ খুলে দেখে একটা চিঠি। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে চিঠিটা।

রঞ্জন, প্রতিশোধটা কেমন হল? ভয় নেই আমি তোর পরিচিত মহলে তোর ভয় পাওয়ার গল্প বলে বেড়াব না। তুই জিজ্ঞেস করেছিলি। আমি কী করি—এই নরকঙ্কালটা এক ডাক্তারবাবুকে সাপ্লাই দিতে যাচ্ছি। এটাই আমার পেশা। আবার দেখা হবে। ভালো থাকিস — প্রিয়।

দেবযান, জানুয়ারী ২০০৬

লিফ্‌টের লাল আলো ইংরেজি জি অক্ষর ছেড়ে এক দুই করে সাতে এসে থামলে লিফ্‌ট থেকে নেমে সামনে চারটে বন্ধ দরজা। বাঁ দিকের প্রথম দরজাটার মাথায় লেখা চ্যাটার্জ্জী কন্‌সালটেন্ট। দরজা দিয়ে ঢুকে সরু লম্বা প্যাসেজ। প্যাসেজ পার হয়ে বাঁদিকে অনেকটা লম্বা জায়গা। হল ঘরের মত। সেখানে পর পর পাঁচটা ছোট বড় টেবিল। প্রতি টেবিল ঘিরে দু-তিনটে করে চেয়ার। সবই এখন খালি। কারণ হল ঘরের সামনের দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িতে এখন সাড়ে আটটা বাজে। রাত সাড়ে আটটা। অফিস ছুটি হয়ে গেছে সেই সন্ধ্যা ছ'টায়।

হল ঘরের শেষ প্রান্তে ম্যানেজারের চেম্বার। দরজার মাথায় লেখা সুপান্থ চ্যাটার্জ্জী—ম্যানেজার। আসলে ম্যানেজার নয়—মালিক। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাতে মালিক অপর্ণা চ্যাটার্জ্জী—সুপান্থ ঘরনি।

ম্যানেজারের দরজার মাঝখানে দু'ফুট বাই তিন ফুট কাঁচ বসানো। ওয়ান-ওয়ে কাঁচ। সুপান্থ অফিসের সবাইকে দেখবে কিন্তু বাইরে থেকে কেউ চেম্বারের ভেতরটা দেখতে পাবে না। আসলে অনেক ভেবেই সুপান্থ কাঁচটা লাগিয়েছে, চেয়ারে বসে অফিসের সবার ওপর নজর রাখা যাবে অথচ চেম্বারের প্রাইভেসিও নষ্ট হবে না। যা দিন কাল পড়েছে, ছোক্‌রা গুলোর ওপর থেকে নজর সরিয়েছ কী ওরা তোমায় ডুবিয়ে ছাড়বে।

এত রাতে সুপান্থর এই চেম্বারে বসে থাকার কথা নয়। সাধারণত বিকেলের দিকে তার কোথাও না কোথাও এ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকেই। না থাকলেও সে পাঁচটার পর কোন দিনই চেম্বারে থাকে না। কিন্তু আজ আছে। আরামদায়ক রিভল্‌বিং চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে সুপান্থ ভাবছিল—দাদা আর নেই।

ঘন্টা চারেক আগে ভাইপো ফোন করেছিল। ধরা গলায় বলল, 'কাকু, বাবা আর নেই।' একটু থেমে সংযোজন করেছিল, 'ফার্স্ট স্ট্রোক বাট কান্ট সারভাইব।' খবরের আকস্মিকতার ধাক্কা সামলে সুপান্থ বলেছিল, 'যদি সম্ভব হয় আমি আজই পৌঁচচ্ছি।'

— আজ আর কী করে আসবে? ফ্লাইটতো নেই। তুমি বরং কাল সকালের ফ্লাইটে চলে এসো। আমাদের তো কাল পর্যন্ত ওয়েট করতেই হবে। মামাও বাঙ্গালোর থেকে কালই এসে পৌঁছবে।

খবরটা পাওয়ার পর সুপান্থ কাল ভোরের ফ্লাইট ধরার সমস্ত বন্দোবস্ত করেছে আর তার ফাঁকে চিন্তা করেছে দাদার কথা। কলেজ লাইফ পর্যন্ত কোন দিন দাদা বলে ডাকে নি সুশান্তকে। আসলে ও ভায়ের চেয়েও বেশী ছিল বন্ধু। একসাথে খাওয়া থাকা ওঠা বসা। একই স্কুল। এক ক্লাস উঁচুতে সুশান্ত, এক ক্লাস নিচে সুপান্থ। এক ক্লাবে খেলাধুলো। ফুটবল মাঠে খেলতও পাশাপাশি, সেন্টার ফরোয়ার্ডে। কে গোল করল বুঝতে সময় লাগত দর্শকদের। এমনকি দলের ছেলেদেরও। অনেকে তো ওদের যমজ বলে মনে করত।

তারপর কর্ম জীবন। চার্টার্ড সুপান্থ রয়ে গেল কলকাতায়, ইঞ্জিনীয়ার সুশান্ত চলে গেল বম্বে। সেও কতদিন আগের কথা। যোগাযোগ কিন্তু ছিন্ন হয় নি কখনো। বছরে চার পাঁচ বার তো দেখা হতই। আর হবে না!

সুপান্থ চেয়ারে সোজা হয়ে বসে। এবার বাড়ি ফেরা দরকার। কিছু গোছ গাছের ব্যাপার আছেই। চোখ চলে যায় দরজার কাঁচ পেরিয়ে সামনের হল ঘরে। সব আলো নেভানো। ওপারের করিডোর থেকে ট্যাড়া হয়ে পড়া আলোর আভায় দেখা যাচ্ছে খালি টেবিল চেয়ার গুলোকে। কিন্তু ও কী!

ঠিক চেম্বারের সামনের টেবিল চেয়ারে — যেখানে সুপান্থর স্টেনো বসে — ওখানে কে বসে রয়েছে? দাদা!!

সুপান্থর সারা শরীরের মধ্যে কী যেন এক স্রোত বয়ে যায়। সারা শরীর অবশ হয়ে আসে, হাত পা নাড়ার ক্ষমতাটুকুও অবশিষ্ট থাকে না। চোখ শুধু আটকে আছে স্টেনোর টেবিলে — দাদাও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ছোট বেলায় ঠাকুর মায়ের কাছে শুনেছে - মানুষ মারা যাওয়ার পর তার সবচেয়ে প্রিয়জনকে দেখা দেয়। সুপান্থের চেয়ে প্রিয়জন সুশান্তর আর কে আছে? সুপান্থ মনে মনে বিড় বিড় করে বলে, 'দাদা আমায় ছেড়ে দাও, আমায় বাঁচতে দাও।'

সুপান্থ পিছনের জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়, অনেক নিচে কতো লোক, গাড়ি, আলো — কলকাকলিতে ভরা সন্ধ্যের কলকাতা। সন্ধ্যেই তো, সাড়ে আট্‌টা আবার রাত নাকি! এতো কাছে এতো লোক তবু সুপান্থ কত একা কত অসহায়। আবার চোখ তার অজান্তেই চলে যায় স্টেনোর টেবিলে, দাদা তেমনি তারদিকে তাকিয়ে বসে আছে, অথচ চেয়ারটাও দেখা যাচ্ছে। সুপান্থর মনে পড়ে, কি একটা বইতে পড়েছিল সুক্ষ শরীরের কথা; এ বোধহয় সেই সুক্ষ্ম শরীরের ব্যাপার।

সুপান্থ অনুভব করে এই শেষ নভেম্বরেও তার গেঞ্জি ঘামে ভিজে উঠেছে। কপালেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। সারাগায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে। পিপাসায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। হঠাৎ সুপান্থর নজর পড়ে টেবিলের বেল পুসটার দিকে — সত্যি সে কী বোকা, বেল বাজালেই দরজায় বসে থাকা দারোয়ান এসে যাবে একথাটা তার একবারও মনে পড়ে নি। রি রি রিং — বেল বাজাতেই দূরের করিডোরে পায়ের আওয়াজ হয়। দারোয়ান এগিয়ে আসছে। হল ঘরের কাছে এসে গোটা দুই আলো জ্বালিয়ে দিল সে। আর তখনি দাদার মূর্তি মিলিয়ে গেল। সত্যি সত্যি মিলিয়ে গেল কি? সুপান্থ তীক্ষ্ণ নজরে দরজার দিকে তাকায়—না মূর্তিটাতো পুরোপুরি মিলিয়ে যায় নি, আবছা হয়ে গেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে সুপান্থ আবিষ্কার করে দরজার কালো কাঁচে ওটা তার নিজেরই প্রতিবিম্ব।

প্রভাত সূর্য্য, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা

তিতলি খুব কল্পনাপ্রবন। তার অনেক কিছুই মনে হয়। মনে হয় সে যেন উড়তে পারে। পাখিদের মত উঁচুতে নয়, প্রজাতিদের মত মাটির কাছাকাছি, ফুলের কাছাকাছি উড়ে বেড়াতে পারে। ওড়েওতো কচি কচি হাত দুটো দু-পাশে মেলে ধরে, ডানার মত বাতাস কেটে কেটে —। আসলে ওর কল্পনা আর বাস্তবের মধ্যে কোন পাঁচিল নেই, কোন বেড়া নেই — তাই কল্পনা আর বাস্তব কেমন মিলেমিশে এক হয়ে যায়। বড়দের কাছে এসব গল্প করলে বড়রা কেমন মিচকে মিচকে হাসে — অবজ্ঞার হাসি, অবিশ্বাসের হাসি — দেখলেই তিতলির গা জ্বালা করে। তাই বড়দের ওর মনের কথা একটুও বলে না। ওর যত কথা, যত গল্প, যত খেলা ঐ ফুল পাখি আর প্রজাপতিদের সাথে।

সেবার তিতলি বাবা-মায়ের সাথে পুরী বেড়াতে গিয়েছিল। প্রথম সমুদ্র দেখে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকেছে — মনে মনে কতো কী কল্পনা করেছে, ঐ দিগন্ত ছোঁয়া জলরাশি দেখে — ঐ অবিরাম ভেঙে পড়া ঢেউ দেখে — ঐ ঢেউয়ের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া পর মুহূর্তে ঢেউয়ের মাথায়

চড়া জেলে ডিঙিগুলো দেখে — ঐ ঢেউয়ের মাথা ছুঁয়ে ওড়া পাখিগুলো দেখে — তার খবর কে রাখে?

বিকেলে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে তিতলির নজর পড়ে কতগুলো ছেলে ভিজে বালি দিয়ে মূর্তি গড়ছে। বাবা মায়ের হাত ছেড়ে দৌড়ে সেদিকে এগিয়ে যায়। কী সুন্দর সুন্দর মূর্তি সব! দাদা দিদিদের বইতে যেমন রাজা-রাণীর ছবি আছে সেইরকম সব রাজা রাণীর মূর্তি! তারপর রয়েছে মেমসাহেবের মূর্তি, কুন্ডলি পাকিয়ে শুয়ে থাকা কুকুরের মূর্তি — আরো কতো কী! তিতলির নজর আটকে যায় একদম শেষ মূর্তিটায়। একটা ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। চুলগুলো এলিয়ে রয়েছে একপাশে — কিন্তু মেয়েটার কোমরের নিচের অংশটা মাছের মত, মস্ত একটা মাছের লেজ রয়েছে দু-পায়ের বদলে! তিতলি অবাক বিস্ময়ে অনেকক্ষণ বড় বড় চোখ মেলে মূর্তিটা দেখে তারপর পিছন ফিরে বাবাকে প্রশ্ন করে 'এটা কী বাবা?' বাবা উত্তর দেওয়ার আগেই যে ছেলেটা মূর্তি গড়ছিল সে এগিয়ে এসে তিতলির তুলতুলে গালটা টিপে আদর করে বলে, 'এটা হল মৎসকন্যা, অর্ধেক মানুষ আর অর্ধেক মাছ।' তিতলির বিস্ময়ের ঘোর যেন আরো গাঢ় হয়। প্রশ্ন করে, 'মৎসকন্যা কোথায় থাকে গো?' ছেলেটা মুখে কোন উত্তর না দিয়ে সমুদ্রের দিকে আঙুল দেখায়। তিতলি আবার প্রশ্ন করে, 'তুমি দেখেছ?' ছেলেটা ঘাড় নেড়ে জানায় সে দেখেনি। তারপর বোধহয় তিতলির পরের প্রশ্ন এড়াতে বলে, 'তোমার বাবা মা এগিয়ে যাচ্ছেন, এবার তুমি যাও।' তিতলি বাবা মায়ের পিছু পিছু চলতে শুরু করে কিন্তু তার মাথায় জল-কেলি করে বেড়ায় মৎসকন্যা।

তিতলিরা যেখানে উঠেছে সেই হোটেলটা রেল স্টেশনের কাছে কিন্তু স্বর্গদ্বার ঘাট থেকে অনেক খানি দূরে। এদিকটাতে সন্ধ্যের পরে সমুদ্রের ধারে ভীড় একদম নেই। তিতলিরা যখন রাতের খাওয়া দাওয়ার পর সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসল তখন জায়গাটা বেশ নির্জন। বাবা-মা একটু দূরে বালিতে বসেছিল, আর তিতলি সমুদ্রের সাথে ধরাধরি খেলছিল। ঢেউ ভেঙে যেই তেড়ে আসছিল অমনি তিতলি দৌড়ে পালাচ্ছিল আর জলগুলো যখন

খিলখিল করে হেসে ফিরে যাচ্ছিল তখন তিতলি আবার এগিয়ে গিয়ে, আমায় ধরতে পারে না। — আমায় ধরতে পারে — বলে হাত তালি দিয়ে নাচছিল। অমনি আবার ঢেউ ভাঙা জল তাড়া করে ছুটে আসছিল তার দিকে। এমনি খানিক ছোটাছুটি খেলা করার পর তিতলি ক্লান্ত হয়ে মায়ের কোলে মাথা রেখে বালির ওপর শুয়ে পড়ে। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, 'মা একটা গল্প বল না।'

নির্জন সমুদ্রের ধারে খেলা করতে করতে হঠাৎ তিতলি শুনতে পায় কে যেন তার নাম ধরে মিষ্টি করে ডাকছে। 'তিতলি ও তিতলি। এসো না ভাই একটু গল্প করি।' মা বাবা অনেকটা দূরে বসে আছে, তাছাড়া এতো মায়ের গলা নয় — কী সুন্দর মিষ্টি মায়া জড়ানো গলা! তিতলি চারদিকে তাকায় কিন্তু কাউকেই দেখতে পায় না। আবার ডাক শুনতে পায়। 'এইতো আমি এদিকে।' ডাকটা আসছে সমুদ্রের দিক থেকে। তিতলি সমুদ্রের দিকে তাকায় কিন্তু আধো অন্ধকারে কিছুই দেখতে পায়না। তবে কি সমুদ্রই তার নাম ধরে ডাকছে? আরো ভালো করে সমুদ্রের দিকে তাকায়, তখন দেখতে পায়, যেখানে ঢেউ ভাঙছে, সেখানে একটা মেয়ে বসে আছে। বয়সে তিতলির থেকে একটু বড়, ডাগর ডাগর চোখ, টিকোলো নাক, টুকটুকে ফর্সা গায়ের রং। এক মাথা কুচকুচে কালো চুল পিঠে লেপ্টে রয়েছে। তিতলি অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, 'তুমি এত রাতে একা একা স্নান করছ?' প্রশ্ন শুনে মেয়েটা খিল খিল করে হেসে ওঠে। হাসি নয়তো যেন জলতরঙ্গে সুরের ঢেউ উঠলো। তিতলি অভিমানী গলায় প্রশ্ন করে, 'অমন করে হাসলে কেন, আমি কি বোকা বোকা প্রশ্ন করেছি?' এবার মেয়েটা হাসি থামিয়ে দুখী দুখী গলায় বলল, 'না না তুমি ঠিকই প্রশ্ন করেছ, যে কেউ আমায় দেখলে এমন প্রশ্নই করত।'

— তবে অমন করে হাসলে কেন?

— কী জানি কেন — বড্ড হাসি পেল। আসলে চব্বিশ ঘন্টা— সারাদিন—দিনের পর দিন আমিতো স্নানই করে যাচ্ছি, তাই তোমার কথা শুনে হেসে ফেলেছি। রাগ কোরো না ভাই।

— তুমি সারাদিনই স্নান করছ? সে আবার কী কথা!

— আমি তো মানুষ নই ভাই, আমি মৎসকন্যা। আমার নাম টুপুর। আমি তো সারাদিন-রাত এই সাগর জলেই থাকি।

তিতলির বাকরোধ হয়ে যায়, একদৃষ্টে টুপুরের দিকে তাকিয়ে থাকে। টুপুর বলে চলে, 'জানতো ভাই আমার ভারি দুঃখ। আমি মানুষও নই আবার মাছও নই, তাই মানুষের সাথেও মিশতে পারিনা। মানুষ, আমায় দেখতে পেলে ডাঙায় নিয়ে যেতে চায়। তাতে আমার খুব কষ্ট হয়। একবার জেলেদের জালে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। তারা তো আমায় দেখে অবাক। একজন বলে, এ জল দেবতা, একে ছেড়ে দাও নাহলে পাপ হবে। আর একজন বলে, না না ছাড়া হবে না, একে চিড়িয়াখানায় দিলে অনেক পয়সা পাওয়া যাবে। আমি তাল বুঝে একজনের হাত থেকে পিছলে কোন রকমে জলে পড়ে চোঁচাঁ সাঁতার কেটে একে বারে মাঝ সমুদ্রে। সেই থেকে আর দিনের বেলা ডাঙার ধারে কাছে আসি না।

আবার মাছেদের সঙ্গে যে মিশব সে উপায়ও নেই। মাছেরা আমায় দেখলেই মানুষ ভেবে একে বারে পগার পার। তাই আমার দুটো মনের কথা বলার মত কেউ নেই।'

তিতলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'আহারে! তা টুপুর দিদি, তুমি এমন মৎসকন্যা হলে কী করে? তোমার মাও কি মৎসকন্যা ছিল?'

— না না, আমার বাবা-মা সবাই মানুষ। আমিও জন্মেছিলাম মানুষ হয়েই। আমাদের বাড়ি ছিল নদীর ধারে। আমি ছোট থেকেই খুব সাঁতার কাটতে ভালোবাসতাম। সারাদিন নদীতে সাঁতার কেটে বেড়াতাম একদিন মা আমায় সংসারের কিছু কাজ করতে বলে মাঠে গিয়েছিল বাবাকে খেতে দিতে। আমি কোন কাজ না করে শুধু নদীতে সাঁতার কাটতে লাগলাম। দুপুর বোদে বাড়ি ফিরে মা যখন দেখলেন সংসারের কাজ কিছুই হয়নি, তখন রেগে আগুন হয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে আমায় বললেন, 'তুই মাছেদের মত নদী সাগর সাঁতরে বেড়া তোকে আর বাড়ি আসতে হবে না।' মায়ের কথা শেষ হতে না হতেই বুঝতে পারলাম আমার পায়ের দিকটা কেমন যেন

অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। জলের মধ্যে ডুব মেরে দেখে আমি শিউরে উঠলাম — আমার কোমর থেকে নিচের দিকটা মাছের লেজের মত হয়ে গেছে।

আমি বাড়ি যাচ্ছি না দেখে বিকেল বেলা মা আমাকে খুঁজতে এলেন। আমি মাকে সব বললাম। মা আমার গলা জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদলেন, আমিও কাঁদলাম। কিন্তু আর আমার বাড়ি যাওয়া হল না। মায়ের কথা না শোনার ফল! তারপর মা যে ক'দিন বেঁচেছিলেন রোজ দু'বেলা নদীর ঘাটে আসতেন — আমরা মায়েবেটিতে গলা জড়াজড়ি করে খানিক কাঁদতাম। আমার শোকে কিছুদিন বাদে মা মারা গেলেন, আর আমিও নদী ছেড়ে সাগরে এসে পড়লাম। তারপর এ সাগর সে সাগর — এ দেশ সে দেশ অনেক ঘুরলাম, অনেক কিছু দেখলাম, শুধু মনের মত সঙ্গী কোথাও খুঁজে পেলাম না।

তিতলি চোখের জল মুছে বলে, 'আহাঃ গো! তোমার তো ভারী দুঃখের জীবন। আমরা যতদিন এখানে থাকব তুমি রোজ এসো, আমি তোমার সাথে গল্প করব, খেলা করব।' টুপুর তখন জলের তলা থেকে একটা ছোট্ট শাঁখ তুলে এগিয়ে ধরে তিতলির দিকে; বলে, 'এই শাঁখটা বাজালে আমি যেখানেই থাকি ঠিক চলে আসব।' তিতলি শাঁখটা নেওয়ার জন্যে হাত বাড়ায় আর ঠিক তখনই মায়ের গলা শুনতে পায়, 'তিতলি রাণী, ওঠো ওঠো, উঠে পড়ো। সানরাইজ দেখতে যাবে না?'

তিতলি ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে। কাঁদ কাঁদ মুখে বলে, 'আমার শাঁখ?' তারপর বিছানার পাশের তাকে টুপুর দিদির দেওয়া শাঁখটা দেখতে পেয়ে ছুট্‌টে গিয়ে শাঁখটা হাতে করে নিয়ে বুকে চেপে ধরে। বাবা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, 'কী হয়েছে মামনি, অমন করছো কেন?' তিতলি গোপন রহস্য ফাঁস করার ভঙ্গীতে বলে, 'এটা টুপুর দিদির শাঁখ, 'এটা বাজালেই টুপুর দিদির সাথে দেখা হবে, এটা হারিয়ে গেলে আর টুপুর দিদির সাথে দেখা হবে না।'

— টুপুর দিদিটা আবার কে?

এবার তিতলি গলা খাদে নামিয়ে চোখ গোল গোল করে বলে, 'টুপুর দিদি মৎসকন্যা গো, ঐ যে মায়ের কথা শোনেনি বলে মৎসকন্যা হয়ে গেছে।

কাউকে বলে দিও না যেন, তাহলে টুপুর দিদি আর আমার কাছে আসবে না। ও মানুষকে বড্ড ভয় পায়। মানুষেরা ওকে অনেক কষ্ট দিয়েছে তো তাই।'

বাবা, মায়ের দিকে ফিরে তিতলিকে লুকিয়ে বলে, 'তোমার ঘুম-পাড়ানি গল্পের রেশ এখনো কাটেনি দেখছি।' তারপর তিতলিকে প্রশ্ন করে, 'তো-এই শাঁখটা টুপুর দিদি তোমাকে দিল?'

— হ্যাঁ গো! বলল এই শাঁখ বাজালেই ও আসবে।

— তাহলে তো শাঁখারি আমাদের ঠকিয়ে দশটা টাকা নিয়ে গেল। বাবার কথায় মা বাবা দু'জনে হেসে ওঠে। তিতলি বোকার মত ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাবা-মা যাই বলুক আর যাই ভাবুক, তিতলি কিন্তু পুরীতে যে কদিন ছিল রোজই টুপুর দিদির সাথে দেখা হয়েছে। সমুদ্রের ধারে গেলেই দেখা হয়েছে তা কিন্তু নয়। ডাকতে ডাকতে, শাঁখ বাজাতে বাজাতে তিতলি যখন আশা ছেড়ে দিয়েছে। অভিমানে সবার অলক্ষে ঠোঁট ফুলিয়েছে। যখন ক্লান্তিতে হতাশায় অভিমানে রাগে মায়ের কোলে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছে, অমনি টুপুর দিদির মিষ্টি গলায় স্বর কানে এসেছে। 'তিতলি আমি এসেছি। অনেক অনেক দূরে — সেই মাঝ সমুদ্রে ছিলাম তো তাই আসতে একটু দেরী হয়ে গেল। রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি।' অমনি তিতলির সব রাগ অভিমান জল হয়ে গেছে।

পুরী থেকে চলে আসার আগের দিন তিতলি আর টুপুরদিদি, দু'জনের গলার স্বরেই কান্নার ছোঁয়া লাগে। টুপুর বলে, 'ভাই তিতলি তোমায় পেয়ে আমার কটাদিন ভারি ভালো কাটলো। আবার কখনো কোথাও সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলে আমায় ডাকবে তো? আমার সাথে দেখা করবে তো? আমায় মনে রাখবে তো?'

তিতলি হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছে ঘাড় হেলায়, হ্যাঁ বোঝাতে। কান্না ভেজা গলায় বলে, 'টুপুর দিদি তোমার কতো কষ্ট, দুটো কথা বলার মত কেউ নেই।' টুপুর সান্ত্বনা দেয়, 'আমার যেমন কপাল, যেমন

কর্ম করেছি তেমনি ফল ভোগ করতে তো হবে! তুমি দুঃখ কোরো না, আনন্দ করো, তুমি তোমার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে ফিরে যাবে, কতো মজা হবে। তুমি দুঃখ করছ কেন?' তারপর আস্তে আস্তে দূর সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হাত নেড়ে বলেছে, 'বিদায় বন্ধু, যদি চাও আবার দেখা হবে।'

মাস ছয়েক বাদে হঠাৎই তিতলিদের যখন কন্যাকুমারী যাওয়ার ঠিক হল, তিতলি বাবাকে জিজ্ঞেস করেছে, কন্যাকুমারীতে কি সমুদ্র আছে? যখন শুনল একটা নয় দু-দুটো সাগর আর একটা মহাসাগর আছে। তখন তিতলির মনটা সত্যিই প্রজাপতির মত নেচে উঠেছিল। আবার টুপুরদির সাথে দেখা হবে সেই আনন্দ যেন নতুন দেশ দেখার আনন্দকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ট্রেনে উঠেই তিতলির সব আনন্দ মাটি হয়ে গেল, যখন মা বলল, 'ঐ যাঃ! তোর শাঁখটা নেব বলে বাইরের টেবিলে রাখলাম কিন্তু নিতে ভুলে গেছি।' তিতলির মনে হল তার সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাওয়ার কোন মানেই হয় না। মনে হল কোন কারণে এবারের বেড়াতে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেলেই ভালো হয়।

কিন্তু ছোট্ট তিতলির কথায় তো কিছুই হয় না, তাই দু'রাত ট্রেনে কাটিয়ে ওরা কন্যাকুমারী পৌঁছেই গেল। মা-বাবার আনন্দের যেন সীমা নেই। তাদের একবারও মনে হচ্ছে না ছোট তিতলি এত চুপচাপ কেন? বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে সমুদ্রের ধারে পৌঁছেই তিতলির কান্না পেয়ে গেল। এই সমুদ্রের কোথাও টুপুরদি আছে, শাঁখটা যদি থাকত — বাজালেই টুপুরদি এসে হাজির হত। কতো দেশ বিদেশের গল্প শোনাত। এখন টুপুরদিকে ডাকার কোন উপায় নেই। তিতলির শুকনো মুখ দেখে বাবা বলে, 'দোকানে চলো আমি তোমায় ঠিক তেমনি আর একটা শাঁখ কিনে দিই।' তিতলি ঘাড় নেড়ে জানায় তার শাঁখের দরকার নেই। মনে ভাবে কী হবে ও সব শাঁখ দিয়ে, ওগুলো বাজালে কি টুপুরদি শুনতে পাবে? মোটেই না।

পরদিন খুব ভোরে উঠে বাবা-মা বলল, 'চলো সানরাইস দেখে আসি।' তিতলির একটুও যেতে ইচ্ছে করছিল না, তবু যেতেই হল। তার

হাঁটার গতি দেখে বাবা বাধ্য হয়ে কোলে নিলেন, আর তিতলি সেই সুযোগে বাবার কাঁধে মাথা রেখে আবার চোখ বোজাল। সাগর তীরে ওরা যখন পৌঁছল তখনো ঘোর অন্ধকার। সবে পুব আকাশে সামান্য আলোর ছোপ লেগেছে। সানরাইস দেখার ভীড় তখনো তেমন জমে ওঠেনি। হঠাৎ তিতলির নজর পড়ে খানিক দূরে, যেদিকে কোন লোক জন নেই সেই দিকে কোমর জলে একটা ছেলে বসে আছে। লম্বা লম্বা মেয়েদের মত চুলগুলো পিঠে লেপ্টে আছে। তিতলি পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় ছেলেটার কাছে। তিতলি কাছে যেতে ছেলেটা ধব ধবে সাদা দাঁত বার করে হাসল। 'তুমি এত সকালে স্নান করছ?' প্রশ্নটা করে তিতলি ভেবে ছিল উত্তর পাবে না। এখানে পৌঁছে থেকে যাকে যা জিজ্ঞেস করেছে কোন কথারই উত্তর পায়নি। সবাই ওর কথা শুনে হাসি হাসি মুখে মাথা নেড়ে নেড়ে যা বলেছে তার একবর্ণও তিতলি বুঝতে পারেনি। এই ছেলেটা কিন্তু পরিস্কার বাংলায় উত্তর দিল, 'এই সাগরেই তো আমার বাড়ি, সারাদিন রাতই তো আমি সাগরে থাকি।' তিতলির দেহে শিহরণ জাগে, প্রশ্ন করে, 'তুমিও কি মৎসকন্যা?' ছেলেটা মাথা ঝাঁকিয়ে হাসে, বলে, মৎসকন্যা নয়, আমি মৎস্-পুত্র। আমার নাম টাপুর।'

— আচ্ছা টাপুরদা তুমি টুপুরদিকে চেন?

— কৈ নাতো! কে তোমার টুপুরদি?

— সে এক মৎসকন্যা। তোমার মতই সারাদিন রাত সাগরে থাকে। সেবার পুরীতে গিয়ে তার দেখা পেয়েছিলাম।

— তোমার কথা যদি সত্যি হয় তো বেশ হয়। এই সাত সাগরে একা একা ঘুরে বেড়াতে আর ভালো লাগে না। আমি আজই পুরী যাব, যদি তোমার টুপুরদির সাথে দেখা হয় তো কাল সকালে তোমার সাথে আবার দেখা করব।

হঠাৎ সবাই হৈ চৈ করে ওঠে, 'ঐতো সূয্যি মামা দেখা দিয়েছেন।' তিতলি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে দিগন্তরেখার লাল টুকটুকে সূর্য সাগর জল স্নান করছে। সামনে সাগরের মাঝে ছড়িয়ে থাকা বিবেকানন্দ রকের মন্দিরটা

প্রথম সূর্যের আলোয় লাল হয়ে উঠেছে। কে যেন মন্ত্রোচ্চারণ করছে, ওঁ জবা কুসুম সঙ্কাসং ...। তিতলি চোখ রগড়ে সাগর জলে যাকে খোঁজে তার দেখা পায় না। টাপুর দাদা কখন যেন জলের তলায় ডুব মেরেছে। বোধহয় এখন পুরীর দিকে যাচ্ছে। যদি টুপুরদিকে খুঁজে পায় কী মজাটাই না হবে। বেচারী টুপুরদি তবু তো একটা সঙ্গী পাবে।

পরদিন সূর্যোদয় দেখতে গিয়ে তিতলি অবাক। দেখে কোমর জলে হাত ধরাধরি করে বসে আছে টাপুরদাদা, টুপুরদি। দুজনের মুখই খুশীতে উজ্জ্বল। টাপুর বলে, 'তোমাকে ধন্যবাদ দিতে এলাম।' টুপুর বলে, 'তোমার কাছে বিদায় নিতে এলাম। এবার মনের মতো সঙ্গী পেয়ে অনেক অনেক দূরে গভীর সাগরে চলে যাব তো, আর তোমার সাথে দেখা হবে না।' তিতলি উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করে, 'আর কক্ষনো দেখা হবে না?'

— না।

— যদি তোমার দেওয়া শাঁখটা বাজাই তাও আসবে না?

— ও শাঁখের কাজ ফুরিয়ে গেছে, ও শাঁখ আর বাজবে না।

তারপর টাপুর-টুপুর হাত নাড়তে নাড়তে নীল সাগরে হারিয়ে যায়। তিতলির চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়ে আবার তাকায় কিন্তু সাগরে ওদের কোন চিহ্ন খুঁজে পায় না।

বাড়ি ফিরে তিতলি দেখে শাঁখটা টেবিল থেকে নিচে পড়ে ভেঙে গেছে।

১

উত্তরবঙ্গ আর অসমের বর্ডারে ছোট্ট স্টেশনটায় নেমে অসীমের মনে হল একি চাকরি নাকি বনবাস! প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা চলে যেতে না যেতেই, যে দুচার জন লোক ট্রেন থেকে নেমেছিল তারাও যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আশে পাশে চার-ছটা কোয়ার্টার ছাড়া আর কোন বাড়ি ঘরও চোখে পড়ে না।

— বাবু কি কলকাতা থেকে এলেন?

মানুষের গলার আওয়াজে অসীম ব্যস্ত ভাবে পিছন ফিরে দেখে, একজন বছর পঞ্চাশের লোক তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। গায়ে সাদা শার্টের ওপর জহর কোট, পরণে ধোয়া খোলের ফিনফিনে ধুতি। অসীম ভদ্রলোকের আপাদমস্তক খুটিয়ে দেখে, ম্লান হেসে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে। আবার প্রশ্ন ভেসে আসে, 'আমাদের নতুন মাষ্টার মশাই?'

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি?

অসীমের কথা শেষ হয় না, আগন্তুক ভদ্রলোকের কোমরের ওপরের অংশ মাটির সমান্তরালে নুয়ে পড়ে, হাত দুখানা জোড় হয়ে মাথার ইঞ্চি ছ'য়েক আগে বিরাজ করতে থাকে, গদগদ কণ্ঠে উত্তর ভেসে আসে, 'অধমের

নাম বামাচরণ দাস। আপনার দাসানুদাস। এখানে সবাই আদর করে মেজবাবু বলে ডাকে।'

স্টেশনে নেমেই অসীমের মনটা যেমন বিষিয়ে উঠেছিল, বামাচরণ বাবুর অভ্যর্থনায় সেই অন্তর্দহের কিছু উপশম হয়। সে বামাচরণ বাবুর পিছনে পিছনে চলতে চলতে স্টেশন মাষ্টারের ছোট্ট ঘরটার সামনে পৌঁছে যায়। সেখানে দু'জন লোক দাঁড়িয়েছিল, তারাও অসীমকে প্রণাম জানায়। বামাচরণ বাবুই পরিচয় করিয়ে দেন, 'এরা দুজন পোর্টার, নিরঞ্জন আর বঙ্কিম।' একটু থেমে আবার বলেন, 'স্টেশনের কাগজপত্র সব আমার জিম্মাতেই আছে। কাল না হয় বুঝে নেবেন। আজ সারাদিন ট্রেন জার্নি করে এসেছেন, এখন বরং কোয়ার্টারে গিয়ে বিশ্রাম করুন'।

অসীমের মনের কথাটা বামাচরণ বাবু বলে দেওয়ায় অসীম সানন্দে ঘাড় নাড়ে, 'সেই ভালো'। বামাচরণ বাবুর নির্দেশে নিরঞ্জন অসীমের সুটকেসটি প্রায় কেড়ে নিয়ে আগে আগে হাঁটতে থাকে। অসীম ব্যাগ থেকে চাদরটা বার করে বেশ করে গায়ে জড়িয়ে নেয়। বামাচরণ বাবু অসীমের পিছনে পিছনে হাঁটছিলেন, বললেন, 'এখানে ঠাণ্ডাটা বেশ কড়া, আপনার কিঞ্চিৎ অসুবিধা হবে। তাছাড়া বিজলী বাতিও নেই, মানুষ জনও নেই বললেই চলে।' অসীম ওর কথার উত্তর না দিয়ে আপন মনে নতুন জায়গা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলে। বামাচরণবাবু প্রসঙ্গ পাল্টে বলেন, 'এখানে কাজ কর্মও বিশেষ কিছু নেই। টাকা পয়সার লেনদেন, হিসেব নিকেশও যৎসামান্য। তবু আগের বড়বাবুর যে কেন অমন হল কে জানে!'

— কেন আগের বড়বাবুর কী হয়েছিল?

— আপনি বোধকরি কিছুই জানেন না?

একটু থেমে বামাচরণ বাবু যোগ করেন, 'আমরাও কি ছাই সবটা জানি। মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ। তবে ওই ওপর-ওয়ালার কথাবার্তায়, ছোট মাথায় যতটুকু বুঝেছি—

— কী বুঝেছেন?

এবার বামাচরণ বাবু অসীমের গায়ের ধারে সরে এসে গোপন কথা ফাঁস করার ভঙ্গীতে চুপিচুপি বলেন, 'ক্যাশে কিছু গড়বড় হয়েছিল। সেই সঙ্গে ক্যাশবুকটাও গায়েব। ওপরওয়ালা অফিসার বলল, "একেবারে আটঘাট বেঁধে কাজ করেছেন!" ব্যাস এক কলমের খোঁচায় বড়বাবু সাসপেণ্ড হয়ে গেলেন।'

— তারপর?

— তারপর আর কী, বড়বাবু মোটঘাট নিয়ে সেই যে চলে গেলেন আর এলেন না। কোন খবরও আর পেলাম না।

২

রাতটা মোমবাতির আলোয় বসে বামাচরণ বাবুর পাঠানো রুটি তরকারি খেয়ে কোন মতে কাটলো। সকালটা কেটে গেল ষ্টোভ হাঁড়ি কড়া ঘষছিয়ে সংসার পাততে। নিজের হাতে বানানো ডিমের ডালনা ভাত তৃপ্তি করে খেয়ে স্টেশনে পৌঁছতে দশটা বাজল। বামাচরণ বাবু অসীমকে দেখে গতকালের মত এক মস্ত নমস্কার ঠুকে বলেন, 'আসুন স্যার।' তারপর একটা কোনমতে দাঁড়িয়ে থাকা কাঠের আলমারির তালা খুলে গোটা দশ বারো মোটা মোটা খাতা বার করে হাঁফ ছেড়ে বলেন, 'আপনারা স্যার শিক্ষিত লোক, একটু চোখ বোলালেই সব বুঝতে পারবেন। তবু যদি কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় আমায় বলবেন স্যার, বুঝিয়ে দেব।'

— ঠিক আছে।

— আমি তাহলে স্যার এখন যাই? সন্ধ্যে বেলা আবার চলে আসবো। অসীম খাতাগুলো উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে আনমনে বলে, 'বেশ যান।' বামাচরণ বাবু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসেন, 'আপনার বাজার হাট কিছু করার থাকলে স্যার বঙ্কিমকে বলে দেবেন।' অসীম খাতা থেকে মুখ তুলে অবাক স্বরে প্রশ্ন করে, 'সে কী বঙ্কিম আমার বাজার করতে যাবে কেন?' বামাচরণ বাবু ততোধিক অবাক হয়ে বলেন, 'ওদের তো স্যার ওটাই চাকরি। এই ছোট্ট স্টেশনে পোর্টারদের আর কী কাজ আছে বলুন?' বঙ্কিম তার টুল ছেড়ে উঠে অ্যাটেনসানের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলে, 'বড় বাবু

যদি কিছু আনার থাকে তো দিন না, মেজোবাবুর বাজার করতে তো সেই যেতেই হবে।' অসীম অবাক চোখে একবার বঙ্কিমের দিকে আর একবার বামাচরণ বাবুর দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনার বাজার বঙ্কিম করবে কেন? ওদের কী কাজকর্ম কিছু নেই? রেলতো ওদের রেখেছে রেলের কাজ করার জন্য।' বামাচরণ বাবু মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন তবুও বোঝা যাচ্ছে চোয়ালটা শক্ত হয়ে উঠেছে। বিড় বিড় করে বলেন, 'ওদের আর কী কাজ আছে?'

—ওদের কোন কাজ নেই বলছেন! ঠিক আছে আমি দু'একদিনের মধ্যেই ওদের কাজ বুঝিয়ে দেব। কাজের কি শেষ আছে? আপনার কাজও ভাগ করে দেব। আমার বাজার দোকানের কথা বলছিলেন না আমার অবসর সময়ে আমি নিজেই ওসব করে নিতে পারব, ও নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।

বামাচরণ বাবু ঢোক গিলে নীরস ভাবে বলেন, 'আচ্ছা।'

৩

বামাচরণ বাবু সন্ধ্যে হওয়ার আগেই এসে পড়লেন। এখন আবার তার মুখ যথারীতি হাস্যময়। সকালবেলা অসীমের কথায় তার মুখটা যে কালো হয়ে গিয়েছিল এখন তাকে দেখে সে কথা বোঝার উপায় নেই। এসেই লম্বা নমস্কার ঠুকে বললেন, 'একটু তাড়াতাড়ি চলে এলাম। আমি এলে তবে আপনি ছুটি পাবেন, তারপর হাত পুড়িয়ে রাঁধতে হবে, তবে খাওয়া।'

— রান্না করার অভ্যাস আমার আছে, অসুবিধা হয় না।

বামাচরণ বাবু চারপাশে চোখ বুলিয়ে প্রশ্ন করে, 'বঙ্কিমটা গেল কোথায়, দেখছি না যে আশে পাশে?'

— প্ল্যাটফর্ম সাফা করছে। ওকে বলে দিয়েছি পূর্ব দিকের অর্ধেক ও সাফা রাখবে, পশ্চিম দিকের অর্ধেক নিরঞ্জন। অফিসঘর ঝাড়পোঁছ পালা করে এক একদিন এক এক জন করবে।

— বাঃ বাঃ বেশ বেশ।

অসীম জানে বামাচরণ বাবুর এ বাহবা কৃত্রিম। তবে মুখ দেখে সেটা বোঝা মুশকিল। হঠাৎ বামাচরণ বাবু বেশ সিরিয়াস ভাবে বলেন, 'যে কথা বলব বলে তাড়াতাড়ি আসা, কাল স্যার আমি নাইট ডিউটি করতে পারব না।'

— বেশ তো কাল থেকে এক সপ্তাহ না হয় আমিই নাইট ডিউটি করব।

— এক সপ্তাহের দরকার নেই স্যার শুধু কাল দিনটা —

অসীম হেসে প্রশ্ন করে, 'কেন কাল কি আপনার বিশেষ কোন কাজ আছে?'

— না স্যার মানে কাজটা কিছু নয় আসলে অন্য একটা ব্যাপার আছে।

— কী ব্যাপার, আপত্তি না থাকলে বলতে পারেন।

বামাচরণ বাবু আমতা আমতা করে বলেন, 'মানে ব্যাপারটা কী— ' ভীত চোখের দৃষ্টি চারপাশে বুলিয়ে অসীমের গা ঘেঁসে এসে চুপি চুপি প্রশ্ন করেন, 'আপনি ভূত বিশ্বাস করেন স্যার?' অসীম একটু সময় নিয়ে বলে, 'বিশ্বাস করি না আবার অবিশ্বাসও করি না। বিশ্বাস করিনা কারণ আমি নিজে কোনদিন দেখিনি। আবার অবিশ্বাস করতে পারিনা কারণ এমন কিছু মানুষের কাছে ভূতের গল্প শুনেছি যারা সাধারণত মিথ্যে বলেন না।'

— আমার কথা স্যার বিশ্বাস করতেও পারেন আবার নাও করতে পারেন, যেমন আপনার অভিরুচি।

— বেশ বলুনতো আগে, শুনে বিচার করা যাবে।

বাইরে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ঘরে লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে দিয়ে বঙ্কিম খানিক আগে বাড়ি চলে গেছে। ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে সিরসির করে হাড় কাঁপানো হাওয়া ঢুকছে। বামাচরণবাবু নিজের টুলটা অসীমের আরো কাছে সরিয়ে এনে শুরু করেন তার গল্প। —

বছর দশেক আগে বড়পেটা স্টেশনে এক ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছিল। কত যে লোক মরেছিল তার ইয়ত্তা নেই। আমিও দেখতে গিয়েছিলাম। ওঃ চোখে দেখা যায় না সে দৃশ্য!

তারপর লাইন পরিষ্কার হল, আবার গাড়ী চালু হল। ধীরে ধীরে মানুষের মন থেকে সেই দুর্ঘটনার স্মৃতি ফিকে হয়ে গেল। একবছর বাদে আবার সেই দুর্ঘটনার তারিখটা ফিরে এলো। আমার অবশ্য তারিখ-টারিখ অত খেয়াল ছিল না। নাইট ডিউটি করছি। পোর্টার নিরঞ্জনের আসার কথা, শরীর খারাপের জন্য আসেনি। একা একা বসে বসে একটু ঝিমুনি এসেছিল। হঠাৎ কাউন্টারে ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভাবলাম রাতের ট্রেনের সময় হয়েছে, হয়তো কেউ টিকট কাটতে এসেছে। বাতিটা উস্কে দিয়ে গুছিয়ে বসে কাউন্টার খুললাম। খুলতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে এসে লাগল। তারপর দেখি, একটা কঙ্কালের হাত কাউন্টার দিয়ে ঢুকে এলো। সেই সঙ্গে কাউন্টারে ওপার থেকে খোনা গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম, "বড়পেটা"।

আমি ভয়ে পিছতে পিছতে কোনরকম দরজার কাছে পৌঁছলাম। দরজা খুলে সোজা দৌড় লাগাব কোয়ার্টারের দিকে—কিন্তু দরজা খুলেই দেখি প্লাটফর্মে একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে তার জানালা দিয়ে একদল নরকরোটি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ব্যাস আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরল, কোয়ার্টারে নিজের বিছানায় শুয়ে আছি। বঙ্কিম সকালে ডিউটি করতে এসে আমায় ঐ ভাবে পড়ে থাকতে দেখে নিরঞ্জনকে ডেকে ধরাধরি করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল।

সেই থেকে স্যার ঐ দিনটা আমি কোনমতেই নাইট ডিউটি করি না। দরকার হয় স্টেশন খালি পড়ে থাক।

অসীম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'স্টেশন তো আর খালি ফেলে রাখা যায় না। কাল রাতে না হয় আমিই ডিউটি করব। নিরঞ্জনকে বলে দেবেন রাতে আসবে।'

— নিরঞ্জন আর বঙ্কিম যাকে যাই বলুন কাল রাতে ওদের ডিউটি করাতে পারবেন না।

— ওঃ! ঠিক আছে আমি একাই সামলে নেব।

— কী দরকার স্যার মিছিমিছি বিপদের মধ্যে গিয়ে। বিদেশ বিভুঁই বলে কথা।

— ডিউটি করলেও যেমন বিপদ, না করলেও তেমনি—এত কষ্টে পাওয়া চাকরিটাই হয়তো চলে যাবে।

বামাচরণবাবুকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে অসীম নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে স্টেশন মাষ্টারের ঘর থেকে বেরিয়ে কোয়ার্টারের দিকে পা বাড়ায়।

৪

একে লোকালয় কম, দিনের বেলাতেই মানুষজনের দেখা পাওয়া ভার, তার ওপর কারেন্ট না থাকায় সন্ধ্যে হতে না হতেই যে যার বাড়ির দোর দিয়ে দেয়। রাত আটটায় সব নিশুতি। অসীম স্টেশন ঘরের দরজা বন্ধ করে, চাদর মুড়ি দিয়ে একটা গল্পের বই নিয়ে বসে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বই এর অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে আসে। অসীম বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ে। হঠাৎ খট্ খট্ আওয়াজে অসীমের ঘুম ভেঙ্গে যায়। চকিতে বামাচরণবাবুর গল্পটা মনে পড়ে যায়। গা টা শির্ শির্ করে ওঠে। চোখ তুলে তাকাতেই বিদ্যুতের শক্ খায় যেন—সামনের আলমারিটার পাশে একটা নর কঙ্কাল দাঁড়িয়ে রয়েছে। অসীম কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যায়। ঠিক তখন পিছন থেকে খনা গলার আওয়াজ শোনা যায়, "বড়পেটা"— অসীম চকিতে পিছন ফেরে, দেখে কাঁচের জানালায় এক টুকরো তীব্র আলোর রেখা—মুহূর্তে সে আলো মিলিয়ে গেল। সামনে তাকিয়ে দেখে কঙ্কাল অদৃশ্য হয়ে গেছে। অসীম টেবিল থেকে তিন ব্যাটারির টর্চটা তুলে নেয়, দ্রুত দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। মরা চাঁদের আলোয় দেখে বিশ পঁচিশ হাত দূরে একটা কঙ্কাল হেঁটে যাচ্ছে। টর্চের তীব্র আলো পড়তেই বোঝা যায় ওটা কঙ্কাল নয় — কালো আলখাল্লার ওপর সাদা কাপড় বসিয়ে কঙ্কালের ভাবেশ তৈরী করা হয়েছে। অসীম দৌড়ে গিয়ে জাপটে ধরে কঙ্কাল ভাবেশ-ধারীকে। অনেক টানা হেঁচড়ার পর আলখাল্লাটা খোলা গেল। অসীম সবিস্ময়ে দেখে—আরে এ যে বামাচরণবাবু! একহাতে একটা চোঙ,

অন্য হাতে পোর্টার হ্যান্ড ল্যাম্পে ডবল লেন্স, পাঁচটা ব্যাটারির আর হাই ওয়াটেজ. ল্যাম্প দিয়ে বানানো প্রজেক্টার, তাতে লোড করা কঙ্কালের পূর্ণাবয়ব মূর্তি! সুইচ মারলেই দূরের দেওয়ালে ফুটে উঠবে কঙ্কালের ছবি।

— আপনি এ কাজ করলেন কেন?

বামাচরণ উত্তর দিতে খানিক সময় নেন। ঘন করে শ্বাস টেনে কেটে কেটে বলেন, 'আমি না হয় বেশী লেখাপড়া জানি না স্যার, কিন্তু রেলে চাকরি তো করছি বহুদিন। এই ছোট্ট স্টেশনের মাষ্টারগিরি ভালোই চালিয়ে দিতে পারি। কিন্তু রেল সে কথা শুনবে না, তারা মাষ্টার পাঠাবেই। আমার ছেলের বয়সী ছেলেরা এসে আমার কাছেই কাজ শিখবে, শিখে আমার ওপরেই খবরদারি করবে। এ আমার সহ্য হয় না স্যার...' এবার কান্নায় ভেঙে পড়ে বামাচরণ।

— ছিঃ! এ আপনার ভারি অন্যায় বামাচরণবাবু। আপনি আমাদের পিতৃতুল্ল হয়েও আমাদের আপন করে নিতে পারেন নি, স্নেহ দিয়ে বশ করতে পারেন নি। শুধু বুকে অভিমান ভরে বসে আছেন? বাড়ান হাত —

অসীমের কথা শুনে বামাচরণবাবু বিস্ময় ভরা চোখে খানিক তাকিয়ে থাকেন, তারপর অসীমের হাত দু'টোকে নিজের দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে। অসীম অনুভব করে ওর হাত দুটো তখন থর থর করে কাঁপছে।

আজ ফাইনাল রাইড। আজ পৌঁছে যাবে অভীষ্ট লক্ষে, গিরি শিখরে। চঞ্চলের মনটা যেন আজ হাওয়ায় ভাসছে। না হোক মাউন্ট এভারেষ্ট বা কাঞ্চনজঙ্ঘা তবু তো শৃঙ্গ বিজয়, এর আনন্দ উত্তেজনাই আলাদা। এর আগে চঞ্চল বেশ কয়েকবার ট্রেকিং-এ গিয়েছে, কিন্তু শৃঙ্গ অভিযান এই প্রথম। অনেক প্রতিকুলতা কাটিয়ে কাল এই বেসক্যাম্পে এসে পৌঁচেছে। চাঁদের আলোয় তুষারাবৃত শৃঙ্গটার মায়াময়রূপ দেখে চঞ্চলের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। অধীর হয়েছিল ঐ চূড়ায় পৌঁছনোর জন্য। কত সম্ভব অসম্ভব চিন্তার স্রোতে গা ভাসিয়ে নিদ্রাহীন রাত কেটে যায় চঞ্চলের।

চঞ্চল এই দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। বাকি সকলেরই শৃঙ্গ অভিযানের অভিজ্ঞতা আছে। কাজেই চঞ্চলের উত্তেজনা যে একটু বেশী হবে এটাই স্বাভাবিক। দলনেতা রতনদা চঞ্চলের মানসিক অবস্থা বোঝেন, তাই কারণে অকারণে তার পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিচ্ছেন। আবার নানান সাবধানতার

কথাও শোনাচ্ছেন। কী পরিস্থিতি হলে কী করতে হবে বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

সকাল আটটা। সামান্য শুকনো খাবার খেয়ে, সবাই প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়ল। প্রায় সব জিনিসই পড়ে রইল বেশ ক্যাম্পে। চঞ্চল চিন্তিত মুখে বলল, চুরি হয়ে যাবে না তো? রতনদা হেসে বললেন, কে চুরি করবে? সঙ্গে নেওয়া হল শুধু কিছু শুকনো খাবার, জল আর পাহাড়ে চড়ার সরঞ্জাম। প্রথমেই পার হতে হবে একটা দুর্গম খাড়াই। সবাই সন্তর্পণে এগিয়ে চলল।

সকাল সাড়ে নটা। অনেকটা খাড়াই পথ পার হয়ে এসে এবার সামনে কিছুটা প্রায় সমতল ক্ষেত্র। সবাই কিছুটা রিল্যাক্স মুডে। চঞ্চল প্রাণভরে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য দেখে। যেদিকে চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ। কোথাও বালির মত কোথাও পাথরের মত শক্ত আবার কোথাও পাহাড়ের গা থেকে ঝুলে আছে বিচিত্র আকৃতিতে। তার ওপর সূর্যের আলো পড়ে যেন আলোর তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে। খালি চোখে তাকানো যায় না সেদিকে। অবশ্য চঞ্চলরা কেউই খালি চোখে নেই, সকলের চোখই রোদ চশমায় ঢাকা। মুহুর্মুহু চমকে উঠছে চঞ্চলের হাতের ক্যামেরার ফ্ল্যাস। প্রকৃতি দেখতে দেখতে, ফটো তুলতে তুলতে চঞ্চল তার অগ্রবর্তীদের রাস্তা ছেড়ে অনেকটা সরে এসেছিল। ঠিক তখনই ঘটে গেল ঘটনাটা—মনে হল পায়ের তলা থেকে বালির মত দানা দানা বরফগুলো যেন সরে যাচ্ছে। চঞ্চল বুঝতে পারে সে চোরাগর্তে পড়েছে। এক্ষুনি তার লম্বা হয়ে শুয়ে পড়া উচিত। কিন্তু শোবে কি, ততক্ষণে তার বুক পর্যন্ত বরফের মধ্যে ঢুকে গেছে। চঞ্চল প্রাণপণে চিৎকার করে — রতন দা —। তার চিৎকার পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। চঞ্চল বরফের স্তুপের মধ্যে তলিয়ে যায়। এক রাশ ঝুরো বরফ এসে ঢাকা দিয়ে দেয় ওপরের আকাশ। চারদিকে অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয় — এরই নাম বোধহয় মৃত্যু। চঞ্চলের মাথাটা হঠাৎ সজোরে কিসে যেন ঠুকে গেল, সেই সঙ্গে নিচে গড়িয়ে পড়ার গতিটাও থেমে গেল।

চঞ্চল ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে তাকায়। অবাক হয়ে যায়। এ কোথায় এসে পৌঁচেছে সে! এটাই কি তবে স্বর্গ? সুনীল আকাশের গায়ে ঝুলে রয়েছে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘ। মনে হয় যেন হাত বাড়ালেই তাদের ধরা যাবে। ঠিক চঞ্চলের পাশ দিয়ে পাথরে পাথরে নেচে নেচে খিল খিল কুল কুল করে বয়ে চলেছে একটা ঝরনা। সুনীল স্বচ্ছ জলে খেলা করে বেড়াচ্ছে রং-বেরঙের ছোট বড় মাছ। ঝরণার ধারে গাছে গাছে ঝুলছে আপেল, বেদানা, কমলালেবু আরো কতরকমের চেনা অচেনা ফল। নানারঙের পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে গাছে গাছে। শিস দিয়ে গান গাইছে। ঝরণার দুপাশে ছোট ছোট ফুলগাছে ভর্তি। কত রঙের কতরকমের ফুল ফুটে আছে সেই ফুল বনে। রঙচঙে ফুলের মেলা ঘিরে উড়ে বেড়াচ্ছে তার চেয়েও রঙীন প্রজাপতি। একটু দূরে কামধেনুর মত সাদা ধবধবে গরু চরে বেড়াচ্ছে। হরিণ ছুটছে, ময়ূর নাচছে। পুরো জায়গাটা তুষারশৃঙ্গ পর্বতের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা!

চঞ্চল ভাবে নিশ্চই সে স্বর্গে পৌঁছে গেছে, এবার নিশ্চই তাকে যম রাজার বিচারশালায় নিয়ে যাওয়া হবে। হঠাৎ দেখতে পায় একটু দূর দিয়ে এক জটাজুটধারী চলেছে। পরনে গাছের ছাল পিঠে তীর ধনুক। চঞ্চল চিৎকার করে ডাকে, সন্ন্যাসীঠাকুর শুনছেন — জটাধারী চমকে ফিরে তাকায়। অবাক চোখে চঞ্চলকে নিরীক্ষণ করে। তারপর ধীরপদে কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে, ক ত্বম? চঞ্চল বলে, সাধুজী, আমি বাঙালি। বাংলা, চলনসই, ইংরাজি আর একটু আধটু হিন্দি জানি। এর বাইরে কোন ভাষা জানি না।

সাধু তখন পরিস্কার বাংলায় প্রশ্ন করেন, তুমি কে? এখানে এলে কী করে?

— আমি চঞ্চল। চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়। কলকাতার কাছে থাকি। কিন্তু এখানে এলাম কী করে তাতো ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। যাচ্ছিলাম শৃঙ্গ বিজয়ে, বরফের মধ্যে চোরা গর্তে পড়ে গেলাম। তারপর গড়াতে গড়াতে সোজা এখানে পৌঁছে গেলাম।

— কী সর্বনাশ! তুমি অন্যায় করেছ। ঘোরতর অন্যায়। আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি —

— প্রভু শুনুন। অভিশাপ দেওয়ার আগে আমার কথাটা অন্তত শুনুন।

— বেশ বল।

— প্রভু, আমি তো এখানে নিজের ইচ্ছায় আসিনি, ভগবানের ইচ্ছায় এসেছি। তা হলে আমার দোষ কোথায় বলুন?

— এটা তুমি ঠিকই বলেছ। তোমাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। ভগবানের এই খামখেয়ালিপনার জন্যে আমরা নাজেহাল হয়ে গেলাম। আমাদের যদি স্বর্গে ঠাঁই নাই হবে তবে কী দরকার ছিল অমরত্বের বর দেওয়ার!

— প্রভু আপনি অমর!

— হ্যাঁ আমি অমর। হাজার হাজার বছর ধরে এই পৃথিবীতে এই মনুষ্য দেহ নিয়ে বেঁচে রয়েছি, ধিক এই জীবনে। মাঝে মাঝে মনে হয় তপস্যা করে বর নয় অভিশাপ পেয়েছিলাম। আশা নেই আকাঙ্খা নেই, আনন্দ নেই, অবসাদ নেই — এ বেঁচে থাকার যে কী যন্ত্রণা সে তুমি বুঝবে না।

— প্রভু আপনার নামটা যদি বলেন!

— আমি অস্বত্থথমা।

— অস্বত্থথমা! মানে মহাভারতের অস্বত্থথমা?

— হ্যাঁ, আচার্য্য দ্রোণের পুত্র আমি।

— প্রভু এখানে এই অমরলোকে আর কে কে আছেন?

— আছেন অনেকেই, সেই রামায়ণের যুগ থেকে যারা অমরত্বের বর পেয়েছিলেন তারা সকলেই এখানে থাকেন। এখানে না থেকে তাঁরা যাবেনই বা কোথায়? মনুষ্যলোকে আমরা মিশতে পারি না, আবার স্বর্গলোকেও আমাদের ঠাঁই হয় না। তাই এই অমরলোকে পড়ে আছি। তবে ভগবানের ইচ্ছায় এ জায়গাটা প্রায় স্বর্গের মতই সুরম্য এবং মানুষের অগম্য তাই আমরা এখানে নিশ্চিন্তে ছিলাম। কিন্তু আজ তোমায় দেখে ভয় হচ্ছে, ভগবান তার দেয় বচন, 'মানুষের অগম্য', ভুলে গেলেন কিনা! এখানেও

মানুষের আগমন শুরু হলে আমরা বড়ই বিপদে পড়ব। আচ্ছা, তুমি কারো কাছে অমরত্বের বর পেয়েছ নাকি?

চঞ্চল একটু চিন্তা করে বলে, কোন দেবতা আমায় বরটর দেন নি। ওনারা আজ কাল বরটর দেন বলে বড় একটা শোনাও যায় না। তবে আমার ঠাকুরমা একবার আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, চিরজীবি হও।

— হতে পারে কোন দেবতা তোমার ঠাকুরমায়ের রূপ ধরে বর দিয়েছেন। না হলে তুমি এখানে আসবে কী করে!

— প্রভু এসেই যখন পড়েছি আর দু'একজন অমর মানুষের সাথে দেখা করা যাবে না?

— এখানে যখন এসেছো দেখা তো সবারই পাবে, তবে আগে দেখি তোমার সত্যি সত্যি এখানে থাকার যোগ্যতা আছে কিনা।

অস্বথথমা এগিয়ে এসে চঞ্চলের মাথায় হাত রাখে, চঞ্চলের মনে হয় কেউ যেন তার মাথায় দশমনি বোঝা চাপিয়ে দিল। সে চোখে সর্ষে ফুল দেখে। হঠাৎ ভীষণ শীত করে, সারা শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে। মনে হয় বহু দূর থেকে খুব পরিচিত কাদের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।—

— ঐ তো, ঐ তো জ্ঞান ফিরছে।

— দে দে এবার গালে দু'চামচ ব্র্যান্ডি ঢেলে দে।

— একটু গরম দুধ হলে ভালো হত।

— ভাগ্যিস কোমরে দড়িটা বাঁধা ছিল।

— বলতে গেলে দড়ি ধরে মরণের পার থেকে টেনে আনা হল।

চঞ্চল ভাবে কোমরের ঐ দড়িটাই আমাকে অমর হতে দিল না।

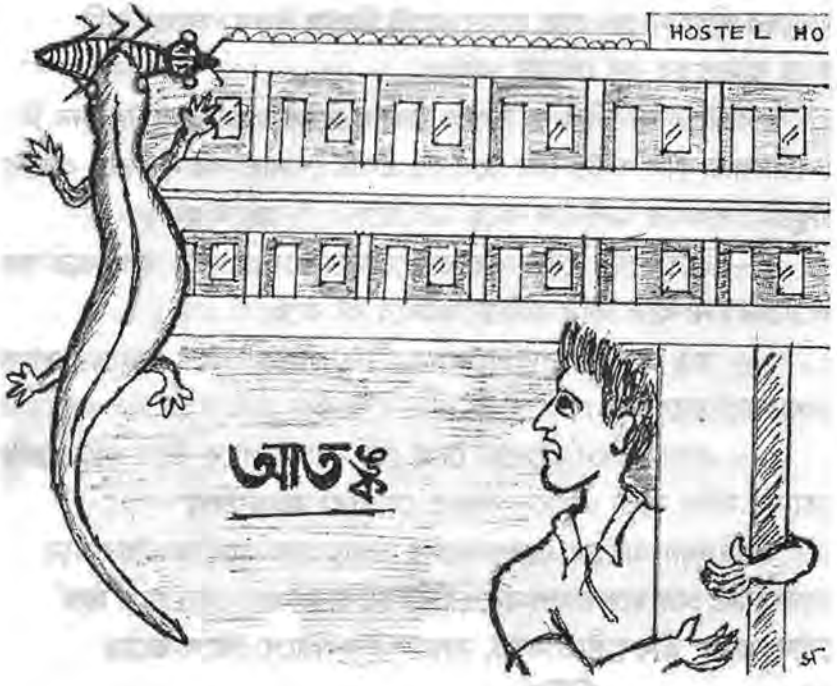

গোল বাধল পীযূষকে নিয়ে। এক সপ্তাহ ধরে হোস্টেলের ছেলেরা ঘোড়ার মত টগবগ করছিল—আর করবে নাই বা কেন? এমন সুযোগ কি বার বার আসে? হোস্টেলের দেড়শ ছেলে একসাথে হৈ হৈ করতে করতে বিয়ে বাড়ি যাবে, সে কি কম মজার ব্যাপার? হোস্টেলের গতানুগতিক জীবনে এমন দিন তো বার বার আসে না। আর আসবেই বা কি করে, এক হোস্টেল ছেলেকে কে আর কবে বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে?

গত রবিবার যখন শুভমের বাবা এসে নিমন্ত্রণ করলেন, হোস্টেল ইনচার্জ সুশীলবাবু অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলে, হোস্টেলের সব ছেলের নিমন্ত্রণ? শুনে শুভমের বাবা অমায়িক হেসে আবার বলেছিলেন, হ্যাঁ মাষ্টারমশাই, সব ছেলেকে নিয়ে আপনি যাবেন। তারপর গদগদ কণ্ঠে যোগ করেছিলেন, আমিও ছেলেকে আপনার মতই প্রশ্ন করেছিলাম, হ্যারে বাবু,

হোস্টেলের সব ছেলেকেই বলতে হবে? সে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে ছিল 'না'। তখন আমি বলেছিলাম তাহলে একটা লিস্ট করেদে, কাকে কাকে বলব।

— কাউকেই বলতে হবে না।

আমি বুঝতে পারিনি ওটা ওর অভিমানের কথা। বলেছিলাম, সেকি কথা দিদির বিয়েতে কাউকে নিমন্ত্রণ করবি না? হোস্টেলে তোর অতো বন্ধু, কাউকে নিমন্ত্রণ করবি না?

— হোস্টেলে সবাই আমার বন্ধু, তাই কাউকে বাদ দিয়ে কাউকে নিমন্ত্রণ করতে পারব না।

এরপর আর আমার অভিমানী ছেলের কথা বুঝতে অসুবিধে হয় নি। আসলে এই হোস্টেল যে ওর মনে কতটা জায়গা দখল করে আছে তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।

বলে বোঝাতে পারব না বলেও বোর্ডিং সম্পর্কে শুভমের নানা মন্তব্য, নানা কথা প্রায় মিনিট পনেরো বলে, সুশীলবাবুকে শুভমের হোস্টেল প্রীতি কতটা বোঝাতে পারলেন বলা কঠিন। তবে তাঁর নিমন্ত্রণে আন্তরিকতার অভাব নেই তা তিনি বুঝিয়ে দিলেন। সুশীলবাবুর হাত ধরে আবার বললেন আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে, সেই আসরে আমার একমাত্র ছেলের বন্ধুরা না এলে উৎসব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, আপনি কথা দিন ছেলেদের নিয়ে আপনি অবশ্যই আসবেন।

সুশীলবাবু মাথা চুলকে বলেছিলেন, দেখুন আমি হেডমাষ্টারমশাইকে না জিজ্ঞেস করে কথা দিতে পারছি না।

— প্লিজ, হেডমাষ্টারমশাইকে আমার হয়ে একটু বুঝিয়ে বলবেন।

*

হেডমাষ্টারমশাইকে বেশী বোঝাতে হয়নি, বরং উনিই উল্টে বুঝিয়েছেন যাবে না মানে, নিশ্চই যাবে। হোস্টেলের একঘেঁয়ে জীবনে এমন স্বাদবদলের সুযোগ তো রোজ রোজ আসে না। পাওয়া যখন গেছে, কাজে লাগান। এও তো একধরনের এক্সকারসান। তবে সাবধানে যাবেন, ট্রেনে ওঠানামার ব্যাপার আছে—কিছু উঁচু ক্লাসের চালাক চতুর ছেলেকে গ্রুপ

লিডার বানিয়ে বেশ কয়েকটা গ্রুপ করে দেবেন। যে যার গ্রুপের ছেলেদের সামলাবে। আপনি ওভার অল দৃষ্টি রাখবেন।

*

শুভমের বাড়ি যাওয়ার আগে তার একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। ওর বাড়ি বেশী দূরে নয়, মাত্র দুটো স্টেশন ট্রেনে যেতে হয়। তবুও ক্লাস ফাইভ থেকে এইট, তিন বছর শুভম হোস্টেলেই ছিল কারণ তার বাবা মনে করেছিলেন ঐটুকু ছেলে একা একা ট্রেনে যাতায়াত করতে পারবে না। এখন শুভম ক্লাস নাইনে পড়ে। মায়ের ইচ্ছায় বাড়ি থেকেই যাতায়াত করে। কিন্তু তিনবছর হোস্টেলে থেকে এমনই মায়া পড়ে গেছে এখনো মাঝে মাঝে এক এক দিন বাড়িতে বলে আসে, হোস্টেলে থেকে যায়।

দেখতে দেখতে বিয়ের দিন এসে গেল। আজ রবিবার, স্কুল নেই, তাই সকাল থেকেই সাজো সাজো রব পড়ে গেল। যারা সপ্তাহান্তে বাড়ি যায় তারাও আজ বাড়ি যায় নি। সুযোগ বুঝে কেয়ার টেকার কাম রাঁধুনী দুজনও সুশীলবাবুর কাছ থেকে এক বেলার ছুটি মঞ্জুর করিয়ে বাড়ি চলে গেছে। এমন সময় চার নম্বর ঘর থেকে খবর এলো পীযূষের জ্বর হয়েছে। কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। সুশীলবাবু তাড়াতাড়ি চার নম্বর ঘরে গিয়ে পীযূষের কপালে হাত দিয়ে দেখলেন জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি দুটো ছেলেকে পাঠালেন ডাক্তার ডাকতে এবং সবাইকে আভাষ দিয়ে রাখলেন আজ বিয়ে বাড়ি যাওয়া হয়তো স্থগিত রাখতে হবে।

খবরটা হোস্টেলের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত রটে যেতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। একটা আশাভঙ্গের হতাশার ছায়া নেমে এলো সবার মুখে। এক সপ্তাহ ধরে গড়ে তোলা স্বপ্ন সৌধটা যেন এক ফুঁয়ে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ল। ছেলেদের সব রাগ গিয়ে পড়ল পীযূষের ওপর, জ্বর বাধানোর আর সময় পেল না ছেলেটা!

ডাক্তারবাবু এলেন, দেখলেন এবং বলে গেলেন, ভয়ের কিছু নেই, ঠাণ্ডা লেগে হয়েছে। ওষুধ দিচ্ছি, কমে যাবে। কিন্তু তাতেও বিষাদের মেঘ কাটলো না, কারণ, সুশীলবাবু মনস্থির করেই ফেলেছেন, পীযূষকে এ অবস্থায়

একা ফেলে তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। আর তিনি না গেলে ছেলেদের কোন সাহসে ছাড়বেন?

*

দু দাগ ওষুধ খেয়ে পীযুষের জ্বর বিকেল নাগাদ ছেড়ে গেল। জ্বরের ঘোর কাটতেই সে তার রুমমেটদের জিজ্ঞেস করে, কিরে তোরা এখনো তৈরি হচ্ছিস না! বিয়েবাড়ি যাবি না? সুমন একটু রাগত স্বরেই উত্তর দেয়, কী করে আর যাব? তুই যে খেল দেখালি, সব বানচাল হয়ে গেল।

শানু জরাক্রান্ত পীযূষের প্রতি কিঞ্চিৎ মমতা দেখিয়ে কোমল স্বরে বলে, তোকে এভাবে ফেলে তো আমরা যেতে পারি না —

পীযূষ ক্লাস নাইনে পড়ে, নেহাত কচি খোকা নয়, তাই ব্যাপারটা বুঝে নিতে তার বেশী সময় লাগে না। সে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। জ্বর ছেড়ে গেলেও সর্দিতে মাথাটা ভার হয়ে আছে। দুর্বলতা খুব একটা না থাকলেও বেশ শীত শীত করছে। একটা চাদর টেনে গায়ে জড়িয়ে নেয়, তারপর সোজা হাজির হয় সুশীল স্যারের ঘরে। সুশীলবাবু তখন রাত্রে সবাইকে কী খাওয়াবেন সেই চিন্তায় বিব্রত ছিলেন। হঠাৎ পীযূষকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে ওঠেন। ধমক লাগান, কী ব্যাপার জ্বর গায়ে হঠাৎ এখানে এসে হাজির হয়েছ কেন?

পীযূষ কোন ভূমিকা না করে সরাসরি প্রশ্ন করে, স্যার, আপনারা বিয়েবাড়ি যাচ্ছেন না? সুশীলবাবু গলায় কোমল ব্যঙ্গ মিশিয়ে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করেন, কী করে যাব?

— স্যার, আমার তো জ্বর ছেড়ে গেছে, এখন ভালো আছি।

— যতই ভালো থাকো, এই শরীরে বিয়েবাড়ি যেতে পারো না।

— আমি আমার যাওয়ার কথা বলছি না, স্যার। আপনারা ঘুরে আসুন।

— না না তা সম্ভব নয়, তোমাকে এ অবস্থায় ফেলে যাওয়া যায় নাকি?

— কেন যাওয়া যাবে না স্যার? ডাক্তারবাবুতো বলে গেলেন, ভয়ের কিছু নেই। তাছাড়া —

— তাছাড়া কী?

— তাছাড়া, আপনিতো জানেন স্যার, শুভম শুধু আমার ক্লাসমেটই নয়, তিন বছর আমার রুমমেট ছিল আর ওয়ান অফ মাই বেষ্ট ফ্রেণ্ড। সে আশা করে বসে থাকবে আর এখান থেকে কেউ যাবে না? পরে যখন শুভম জানবে আমার জন্যেই কারুর যাওয়া হয় নি—আমি ওর কাছে মুখ দেখাতে পারব না, স্যার। শুভম খুব অভিমান করবে স্যার।

সুশীলবাবু খানিক চিন্তা করেন, তারপর পীযূষের সুরে সুর মিলিয়েই বলেন, এখনকার বাজারে এতজনের খাবার নষ্ট হবে সেটাও বিচ্ছিরি ব্যাপার। আবার এদিকে রাঁধুনীও নেই। বিয়েবাড়ি না গেলে ছেলেগুলো খাবেই বা কী?

— আবার ভেবে দেখুন স্যার হোস্টেলের ছেলেরা এক সপ্তাহ ধরে দিন গুণছে বিয়েবাড়ি যাবার জন্যে। না যাওয়া হলে ওরাও স্যার খুব দুঃখ পাবে। তাই বলছিলাম কী স্যার, আপনারা ঘুরে আসুন। দু'তিন ঘন্টার ব্যাপার তো, আমি বেশ কাটিয়ে দিতে পারব।

— তুমি এখন বেশ সুস্থ বোধ করছ তো?

— হ্যাঁ স্যার।

— এতবড় হোস্টেলে একা থাকতে তোমার ভয় করবে না তো?

— না স্যার। ভয়ডর জিনিসটা আমার একটু কমই আছে। আপনারা নিশ্চিন্তে যেতে পারেন।

*

নিমেষে হোস্টেলের চেহারা আবার বদলে গেল। বিষাদের মেঘ কেটে ঝলমলিয়ে রোদ উঠলো যেন। ঘরে ঘরে কলরব শুরু হয়ে গেল। আধঘন্টার মধ্যে সবাই সেজেগুজে বেরিয়ে পড়ল। সুশীলবাবু যাবার সময় আর একবার পীযূষের কপালে হাত দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, ওকে সাবধানে থাকতে বলে এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকার নির্দেশ দিয়ে, সময়মত ওষুধ

খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিয়ে হোস্টেলের বাইরের গেটে তালা মেরে গুনা দিলেন।

হোস্টেলটা মাঠের মাঝখানে। হোস্টেল আর স্কুলের সামনে দিয়ে একটা রাস্তা বরাবর সবুজ ধানক্ষেত চিরে ডানদিকে স্টেশন আর বাঁদিকে বাস রাস্তা পর্যন্ত চলে গেছে। হোস্টেল থেকে ট্রেনগুলোকে খেলনা গাড়ির মত দেখায়। আবার দূরের হাইওয়ে দিয়ে বাস লরি গেলে সেগুলোকেও খেলনা গাড়ি বলে মনে হয়। পীযূষ হোস্টেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখে, দিন শেষের আলো গায়ে মেখে হোস্টেলের ছেলেরা যেন মিছিল করে স্টেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একটা বুক উজাড় করা দীর্ঘশ্বাস বার হয়ে আসে। তাতে কতটা শুভমের বাড়ি যেতে না পারার হতাশা, আর কতটা ওতোগুলো ছেলের অব্যক্ত ভৎর্সনা থেকে মুক্তি পাওয়ার তৃপ্তি মিশেছিল হিসেব করা মুশকিল।

শীতের বিকেল ফুরিয়ে খুব তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে হয়ে এলো। লম্বা বারান্দায় সারি সারি আলোগুলো জ্বলছে। সুশীল স্যার বেরোনোর আগে ছেলেদের নির্দেশ দিয়েছিলেন বারান্দার সব আলো জ্বালিয়ে দিতে। পীযূষ বারান্দা থেকে ঘরে এসে দরজায় ছিটকিনি আটকে দেয়। স্যারের নিদের্শ মত টেবিলে রাখা দুধ পাঁউরুটি খেয়ে, ওষুধ খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল চাদর মুড়ি দিয়ে। ঘুম এলো না, আসার কথাও নয়; এত তাড়াতাড়ি শোয়া তার অভ্যাস নয়। কিন্তু কী করবে? মাথাটা এমন ভার হয়ে আছে যে গল্পের বই পড়তেও ভালো লাগছে না। ঘরের আলোটা বড্ড চোখে লাগছে, নিবিয়ে দেবে কিনা ভাবছে, এমন সময় আলোটা নিজেই নিবে গেল—লোডশেডিং। চারদিকে কুপকুপ করছে অন্ধকার। পীযূষের কেমন গা ছমছম করে। এই প্রথম সে নিজেকে নিসঙ্গ অনুভব করে। তাড়াতাড়ি উঠে হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে নেয়। হ্যারিকেনটা কমিয়ে ঘরের এককোণে রেখে আবার বিছানায় এসে সবে শুয়েছে-কে যেন দরজায় টোকা দিল। প্রথমে একবার আস্তে, তারপর দুবার জোরে। পীযূষের গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। বাইরের মেন গেট তালা দেওয়া, আবার হোস্টেলের গেটেও তালা দেওয়া, এসব পার

হয়ে কে এসে তার দরজায় টোকা মারছে? পুরো স্কুল আর হোস্টেল চত্বরটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সাধারণ মানুষের পক্ষে সে পাঁচিল ডিঙনো অসাধ্য তাহলে কে এসেছে তার দরজায়, কী করে এসেছে? পীযূষ বিছানায় উঠে বসে কাঁপা গলায় প্রশ্ন করে, 'কে?' উত্তরে পর পর তিনবার জোরে টোকা পড়ে দরজায়। পীযূষ দেহের মধ্যে কাঁপুনি অনুভব করে, তবু গলার স্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলে, সাড়া না দিলে দরজা খুলব না। কে?

কিছুটা সময় নীরবে কেটে যায়। দরজার ওপার থেকে কোন উত্তর আসে না। তারপর বেশ জোরে জোরে দুটো টোকা পড়ে। হোস্টেলের দরজাগুলো তেমন মজবুত নয়, কাঠের ফ্রেমের ওপর মোটা এ্যালুমিনিয়াম চাদর বসানো। একটু শক্তিশালী মানুষের পক্ষে ভেঙে ফেলা খুব একটা দুরুহ কাজ নয়। পীযূষ চিন্তা করে তার চেয়ে দরজা খুলে দেওয়া ভালো—তাতে হয়তো বিপদ কম হতে পারে। নিজেকে সাহস জোগাতে ভাবে - নিশ্চই কেউ তার সাহস পরীক্ষা করছে, দরজা খুললেই দেখবে হয়তো কোন পরিচিত মুখ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাই বা কি করে হয়। সবাই তো তার চোখের সামনেই চলে গেছে! তবে? হয়তো সে যখন বিছানায় শুয়েছিল তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ইতিমধ্যে ঘন্টা দুই আড়াই সময় পেরিয়ে গেছে, হোস্টেলের ছেলেরা ফিরে এসেছে বিয়েবাড়ি থেকে। কিন্তু তা যদি হয়-এতগুলো ছেলে বিয়েবাড়ি থেকে ফিরছে একটু হৈ চৈ হত না?

যখন কোনদিক দিয়েই যুক্তির বেড়া বাঁধতে পারে না তখন মুক্তির উপায় হিসেবে মনস্থির করে দরজা খুলে দেখাই যাক না কে এসেছে। একহাতে হ্যারিকেনটা তুলে ধরে দরজা খুলে বাইরে তাকায়। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। যেন অন্ধকার বিশাল হোস্টেল বাড়িটা হাঁ করে তাকে গিলতে আসে। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসে। পর মুহূর্তেই আবার দরজায় টোকা পড়ে-একবার, দু'বার, তিনবার। পীযূষ অনুভব করে এই শেষ অঘ্রাণেও তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। ওদিকে দরজায় টোকা মারার আওয়াজ হয়েই চলেছে? হ্যারিকেন হাতে নিয়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়ায়। টোকা মারার সাথে সাথেই দরজা খোলে তবুও দশ-বার সেকেণ্ড সময় চলে

যায়। দরজা খুলে হ্যারিকেন হাতে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। মনে হয় লম্বা বারান্দার শেষপ্রান্তে বাঁকের আড়ালে কে সরে গেল। বারান্দার শেষপ্রান্তে হাজির হয়, বাঁকের পর একটু এগিয়ে বারান্দা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সেখানে কোন জনমানবের চিহ্ন নেই। বারান্দার প্রান্তে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে নিচেটা দেখার চেষ্টা করে কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কিছুই নজরে পড়ে না।

ওদিকে তার ঘরের দিক থেকে আবার দরজায় টোকা মারার আওয়াজ আসে। দৌড়ে সেদিকে যেতে গিয়ে হ্যারিকেনটা বার দুই দপদপ করে নিবে যায়। চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে পীযূষ থরথর করে কাঁপতে থাকে। একবার বারান্দার শেষপ্রান্তের দিকে তাকায়, একবার তার ঘরের দিকে তাকায়। কোনদিকে যাবে ঠিক করতে পারে না। একটা থামকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। সুশীলবাবুকে বলা তার কথাটা যেন তাকে ব্যঙ্গ করে তার কানের কাছে ফাটা রেকর্ডের মত বেজেই চলে, আমার ভয় ডর একটু কমই আছে স্যার।

পীযূষ থাম আঁকড়ে ধরে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তা সে নিজেও জানে না। সে সজ্ঞানে ছিল কি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল তাও জোর দিয়ে বলা মুশকিল। শুধু থেকে থেকে তার কানে আসছিল দরজায় টোকা মারার ঠক ঠক ঠক আওয়াজ।

একসময় কারেন্ট এলো হোস্টেল বাড়িটার লম্বা বারান্দায় সার সার আলোগুলো জ্বলে উঠলো। পীযূষের বুকে সাহস ফিরে এলো। পায়ে পায়ে নিজের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঠিক তখন আবার তাকে চমকে দিয়ে আওয়াজ হল ঠক ঠক ঠক-। পীযূষ তাকিয়ে দেখে একটা বিশাল টিকটিকি গড়সড় একটা পোকা মুখে নিয়ে বাগে আনার চেষ্টা করছে, আর প্রয়োজন মত তাকে আছাড় মারছে দরজার এ্যালুমিনিয়াম চাদরের ওপর।

ভূবন হাইত চলে গেল। বড্ড অকালেই চলে গেল বেচারা। চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছর বয়সটা কি আর মরবার বয়স?'লোকে বলে, মানুষের হৃদয় নাকি আজকাল পাষাণের মত হয়ে গেছে, কোন কিছুতেই আর বিচলিত হয় না—আমার মনে হয় কথাটা ঠিক নয়। তাই যদি হত তাহলে নিত্য নিয়মিত এত লোকের হার্ট ফেল করত না। এই ভূবনের কথাই ধরা যাক। সুন্দর চেহারা, নাদুস নুদুস নাড়ু গোপালের মত। সকালে দিব্যি দোকানে গেল, দুপুরে বাড়ি এলো হাসি হাসি মুখে। কোন রোগ নেই যন্ত্রণা নেই, কিচ্ছু না। স্নান খাওয়া করল, তারপর রোজকার অভ্যেস মত বিছানায় শুয়ে নাক ডাকাতে শুরু করল। বউ বলল একটু পাশ ফিরে শোওনা গো। অত নাক ডাকলে পাশে কেউ শুতে পারে? ব্যাস যেই পাশ ফিরল অমনি ফেল—হার্ট ফেল। নাকের ডাকা ডাকি চিরতরে থেমে গেল ডাক্তার ডাকার সময় না দিয়েই।

ভূবন তো চলে গেল। কিন্তু বউ-বাচ্ছাটাকে ফেলে গেল অকূল-পাথারে। ভূবনের তেজারতি কারবার ভালোই চলত, তাই সংসারও চলত স্বচ্ছলভাবে। কিন্তু ভূবন মারা যেতে দেনাদারেরা গা ঢাকা দিল। ভূবনের অনপড় বউ বা দশ বছরের ছেলে, দুজনের কারোরই সাধ্য ছিল না দোকানের খাতার পাঠোদ্ধার করে। ফলে যা হবার তাই হল। প্রথম মাসটা এদিক সেদিক করে চলে গেল। দ্বিতীয় মাসটাও টেনে টুনে ধার-কর্জ করে কাটল। তৃতীয় মাসে অবস্থা এমনই দাঁড়াল যে দুবেলা দুমুঠো ভাত জোটাও দায় হল।

এমনই যখন অবস্থা, একদিন ভোর বেলা ঘোষ পাড়ার শ্যামলাল এসে হাজির। নগদ এক হাজার টাকা ভূবনের বউয়ের হাতে দিয়ে বলল, আমি জাত গোয়ালার বেটা। আমি কি তোমাদের টাকা মেরে দিতে পারি? গত মাসটায় বড্ড মুশকিল হয়ে গেল তাই দিতে পারি নি, তাই এমাসে দুমাসের সুদের টাকা একসঙ্গে নিয়ে এসেছি। আমি জাত গোয়ালার পো আসল দিতে পারি আর নাই পারি সুদের টাকা মাস পয়লায় ঠিক পেয়ে যাবে কোন চিন্তা কোরো না।

শ্যামলাল আরো অনেক কথাই বলে গেল। ভূবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক কত মধুর ছিল, ভূবন কত ভালো লোক ছিল, সব কথাই বলল শুধু বলল না বাড়ি বয়ে সুদের টাকা দিতে আসার আসল কারণটা। অবশ্য কারণটা বেশীদিন চাপাও রইল না। এ কান ও কান হতে হতে একদিন ভূবনের বউয়ের কানেও পৌঁছল কথাটা,—শ্যামলাল কি আর এমনি এমনি উবজে এসে টাকা দিয়েছে? কলকাতায় ছানা দিয়ে লাস্ট ট্রেনে ফিরছিল সেদিন, স্টেশনে নেমে সবার পেছনে দুলকি চালে হাঁটছিল। মোটা শরীর নিয়ে হাঁটতে পারে নাতো জোরে, তায় আবার কাঁধে বাঁক, বাঁকের দু মাথায় দুটো করে দুধের ড্রাম। হোকনা খালি, তাও কি কম ভার? হাটতলায় যখন পৌঁছল তখক্ষণে বাকি প্যাসেঞ্জাররা যে যার বাড়ি পৌঁছে গেছে। কোথাও কেউ নেই, শুনশান হাটতলা। একপাশে একটা ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে তাতে আলো হয়ে আছে পুরো হাটটা। গুন গুন গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিল

শ্যামলাল। হাটের মাঝামাঝি আসতেই হঠাৎ কে যেন খোঁনা গলায় হাসে। শ্যামলাল এদিক ওদিক তাকায় কাউকে দেখতে পায় না। এবার খোঁনা গলায় কে যেন ডাকে, ওঁ শ্যাঁমলাল, এঁদিকে শোঁন নাঁ। এবার শ্যামলাল দেখতে পায় ভূবনের বন্ধ দোকানের অন্ধকার বারান্দায় বসে একটা নরকঙ্কাল তাকে হাত তুলে ডাকছে। শ্যামলাল ছুটে পালাতে যায় কিন্তু খোঁনা গলা বলে, পাঁলাতে গেঁলে মরবি, ঘাঁড় মঁটকে দেঁব। শ্যামলাল পালাতে পারে না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে। খোনা গঁলা বলে, দুঁমাস সুঁদ দিঁসনি কেঁন? আঁমার বৌঁ ছেঁলে যেঁ নাঁ খেঁয়ে মঁরছে!

শ্যামলালা কাঁপা গলায় বলে, দিয়ে দেব।

— কঁবে?

— কালকেই দিয়ে দেব।

— মঁনে থাঁকে যেঁন। যাঁ, বাঁড়ি যাঁ।

শ্যামলাল কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে আসে। পিছন ফিরে তাকানোর আর সাহস হয় না। পরের দিন দিনের আলো ফুটতে না ফুটতেই ছোটে ভূবনের বাড়ির উদ্দেশ্যে।

সব শুনে ভূবনের বউ কেঁদে ফেলল। আকাশের দিকে তাকিয়ে কপালে জোড় হাত ঠেকিয়ে বলল, ওগো তুমি সগ্‌গে গিয়েও আমাদের এতো খেয়াল রেখেছ!

*

শ্যামলালের ভূত দর্শনের পর এক সপ্তা কাটেনি আবার দর্শন দিল ভূবনের ভূত। এবার দেখলেন হারু খুড়ো। হারু খুড়ো ভূত দেখলেন বলতে গেলে বাড়ির উঠনে। শুতে যাবার আগে বাথরুম করতে গিয়েছিলেন উঠোন পেরিয়ে বাঁশ ঝাড়ের দিকে। হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেখেন হাত দশেক দূরে বাঁশ বাগানের ঘন অন্ধকারে একটা নরকঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে। হারু খুড়ো তাকাতেই নরকঙ্কাল বলল, কিঁ গোঁ খুঁড়ো চিঁনতে পাঁর? আঁমি ভূবন হাঁইত। আঁমার সুঁদটা দুঁমাঁস পাঁইনিঁ। দেঁবেঁ নাঁ ঘাঁড় মঁটকাঁব?

এইভাবে মাসখানেকের মধ্যে জনা চারেক ভুবনের ভূত দেখল। তারাতো ভুবনের বাড়ি টাকা শুধতে এলোই, তা ছাড়াও কিছু ভীতু মানুষ বিনা দর্শনেই আত্মসমর্পণ করল। ফলে ভুবন হাইতের মৃত্যুতে প্রায় থেমে যাওয়া তার সংসার আবার বেশ গড় গড় করে চলতে লাগল।

২

জটাপাগলা বছর পাঁচ ছয় হল, এ গ্রামে এসেছে। যতক্ষণ হাটতলায় দোকানপাট খোলা থাকে ততক্ষণ সে হাটেই থাকে। হাটের দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেলে সবার সঙ্গে সেও গ্রামে চলে আসে। এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরে যা জোটে খায়। খাওয়া জুটলে ভালো না জুটলেও পরোয়া নেই—হা পিত্যেশ করে না। দুপুর হোক বা রাত্তির খাবার সময় পেরিয়ে গেলে, খাওয়া হোক আর নাই হোক সঙ্গের পুঁটুলিটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ে যেখানে হোক, গাছতলা, সানের ঘাট, কিম্বা কারো বার-বারান্দা কোথাও শুতেই জটার অরুচি নেই।

জটার পেছনে লাগার লোক অনেক। তার প্রথম শত্রু হল কুকুররা। তার গোঁফ দাড়ি চুল জটা সমেত মস্ত বড় মাথাটা দেখলেই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে। আশ্চর্য সহ্য শক্তি লোকটার, কুকুরগুলোর হাজার চ্যাচামেচিতেও বিরক্ত হয় না। যদি মনে করে থাকে এই জায়গাটায় শোব, সেখানে যদি কুকুরের পাল ওকে ঘিরে ধরে চ্যাচায় তবু সেখানেই শুয়ে থাকবে। ভয় নেই ঘৃণা নেই, কিচ্ছু নেই।

কুকুরদের থেকে বেশী বদমায়েশ মানুষগুলো। কুকুরেরা শুধু দূর থেকে চ্যাচিয়েই ক্ষান্ত কিন্তু মানুষ তো তা নয়। কে কাপড় ধরে টানে, কে ঝোলা ধরে টানে কে চুল দাঁড়ি ধরে টানে। জটা খুব একটা প্রতিবাদ করে না। খুব বিরক্ত হলে এক এক সময় হয়তো লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে।

সেদিন দুপুরে জটা সানের ঘাটে শুয়েছিল। দুদিন বাদে ভরপেট খাওয়া জুটে ছিল তাই বেশ সুন্দর ঘুম আসছিল। কিন্তু ঘুমনোর কি জো আছে, যেই চোখটা লেগেছে অমনি জুটে গেল এক পাল ছেলে। সমানে জ্বালাতন করতে শুরু করল। জটার বিশ্রামে অবশ্য খুব একটি ব্যাঘাত হচ্ছিল না, যতক্ষণ

ছেলেগুলো দূর থেকে নানা কথা বলে অঙ্গ ভঙ্গী করে তাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু জটা কিছু বলছে না দেখে ছেলেগুলোর ক্রমশ সাহস বাড়তে লাগল। তারা জটার দাঁড়ি ধরে চুল ধরে টান দেয় আর পালিয়ে যায়। জটা তবুও নির্বিকারভাবে শুয়ে থাকে। হঠাৎ ছেলেগুলো জটার মাথার তলা থেকে ঝোলাটা ধরে টান মারে। ঝোলাটা ছিঁড়ে পাগোলের সম্পত্তি ছড়িয়ে পড়ে। এবার আর জটা নির্বিকার থাকতে পারে না। উঠে বসে লাঠি উচিয়ে ছেলেগুলোকে খেদিয়ে দিয়ে ঝোলার জিনিসপত্র গোছাতে লাগে। তার মধ্যে একটা কালো আলখাল্লা দেখে ছেলেরা সেটা জটার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। আলখাল্লাটা ওল্টানো ছিল। সোজা করতেই ছেলেরা শিউরে ওঠে, কালো কাপড়ের গায় সাদা কাপড়ের ফালি বসিয়ে কঙ্কালের আবয়ব করা।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ে হাওয়ার বেগে। ছোট্ট জনপদটার নিস্তরঙ্গ জীবনে ঢেউ ওঠে। নিমেষে সারা গ্রামের মানুষ জড়ো হয়ে যায় সেই সানের ঘাটে। বিশেষ করে শ্যামলাল, হারু খুড়ো, আর যারা ভূত দেখেছিল তারাই হম্বি তম্বি করতে লাগল বেশী। মেরে পাগোলের পাগলামি চিরকালের মত ঘুচিয়ে দেওয়ার জন্যে আস্তিন গোটাতে লাগল। জটা কিন্তু মারমুখী মানুষের সামনে পড়েও ঘাবড়ায় না। অস্বীকার করে না কোন কিছুই। বলে, হ্যাঁ আমি ভূবন হাইতের ভূত সেজেছি। তারপর বেশ জোরের সঙ্গে বলে, যা করেছি ঠিক করেছি। যা করেছি বেশ করেছি। জনতা আরো ক্ষেপে ওঠে, দুচার ঘা চড় চাপড় আছড়ে পড়ে জটার ওপর। জটার তাতে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই তার মুখে তখনো একই কথা, বেশ করেছি। ঠিক করেছি। জনাকতক পাড়ার মাতব্বর গোছের মানুষ মারমুখী জনতাকে কোনরকমে ঠেকিয়ে, জটাকে তার বক্তব্য বলার সুযোগ করে দেয়। বলে, তুই যে বলছিস, বেশ করেছিস—তা কেন এরকম করেছিস বল? তুই রাতে-ভিতে ভূত সেজে মানুষকে ভয় দেখিয়েছিস। যদি পুলিশে দিই পুলিশ তোকে রুলের গুঁতো মেরে হাত পা ভেঙে দেবে, জানিস?

— জানি জানি সব জানি। হয় তোমরা মেরে পেটাই পরোটা বানাবে, নয় পুলিশ মেরে হাড় গোড় ভাঙা দ বানাবে।

— এত সব জেনেও একাজ করলি কেন?

এবার জটার গলার স্বর বদলে যায়। এ আর পাগোল পাগোল অসংলগ্ন কথা নয়, এ যেন দরদী মনের কথা। উঠে দাঁড়িয়ে সামনের মানুষটার হাত ধরে গাঢ় স্বরে বলে, বলতো বাবু ভূবন হাইত কেমন মানুষ ছিল? একটু থেমে নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেয়, কেউ কোনদিন বিপদে পড়ে ভূবনবাবুর কাছে গিয়ে বিমুখ হয়নি। কারো কাছে একটা নয়াপয়সা বেশী সুদ নেয় নি। একটা মানুষেরও বন্ধকী জিনিস বাজেয়াপ্ত করেনি। কোন ভিখিরি পর্যন্ত মানুষটার কাছ থেকে খালি হাতে ফেরেনি। যে মানুষটা সবার বিপদে টাকার থলি হাতে পাশে দাড়িয়েছে, সে যেই মরল তার পরিবার অকূল সাগরে ভেসে যাবে! তাদের পাশে দাঁড়াবার কেউ থাকবে না। মনে ভাবলাম আমিও তো ভূবনবাবুর কম খাইনি, প্রায় রোজ সকালে চা পাউরুটি আমার বরাদ্দ ছিল। চাইলে এক দুটো টাকাও দিত। তার পরিবারের বিপদের দিনে আমারও তো কিছু করা চাই। কিন্তু আমি পাগোল ছাগোল মানুষ কী বা করতে পারি। শেষে অনেক চিন্তা করে ঝুলি ঝেড়ে যা জমা পয়সা ছিল তাই দিয়ে কালো সাদা কাপড় কিনলাম, রাত জেগে সেলাই করলাম নিজে হাতে —

হঠাৎ জটার কথা আবার অসংলগ্ন হয়ে পড়ে। ধেই ধেই করে নাচতে থাকে আর বলতে থাকে, আমি যা করেছি বেশ করেছি। শ্যামলাল, হারু খুড়োদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, সবার মুখোশ খুলে দিয়েছি। তোমরা মারবে? মারো, মারো। মেরে মেরে মেরেফেলো — হাঃ হাঃ হাঃ।

সুমনার বিয়ে শেষপর্যন্ত ঠিক হল। যে হারে সম্বন্ধ জোগাড় আর সম্বন্ধ ভাঙার খেলা চলছিল সেই আঠার-উনিশ বছর বয়স থেকে, সুমনা মনে মনে ভেবেই নিয়েছিল তার আর বিয়ে হবে না। শেষপর্যন্ত এই আঠাশ বছর বয়সে তারও বিয়ের ফুল ফুটল। কথায় বলে, সবুরে মেওয়া ফলে—পাত্র যা জুটল তা সুমনার আশাতীত। ছেলেটা—ছেলেটা না বলে লোকটাই বলা উচিত, সুমনা নিজের মনেই একটু হাসে, শশাঙ্কর বয়স পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে গেছে। অবশ্য বয়সটা সুমনার সঙ্গে মানানসই। সে আকাশবাণীতে কাজ করে—এ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার। ভাই বোন মা বাবা কেউ নেই। কোনদিকে কোন দায় নেই, পিছুটান নেই। পাত্র হিসেবে যথেষ্টই লোভনীয়। তবে একটা কিন্তু আছে—শশাঙ্কর আগে আর একবার বিয়ে হয়েছিল—সে দোজবরে। তবে সে স্ত্রী বিয়ের পর বাঁচেনি বেশীদিন। বছর খানেকের মধ্যেই মারা গিয়েছে, সন্তান সন্ততি নামক পিছু টান না রেখেই। শশাঙ্ক অকপটে সব কথা স্বীকার করে সুমনার মত চেয়েছে, কোন রাখ ঢাক করেনি। সুমনার মনে যে ছোট্ট একটু দ্বিধার ভাব উদয় হয়েছিল তা শশাঙ্কর অকপট স্বীকারোক্তি এবং অন্যান্য গুণের স্রোতে ভেসে গিয়েছিল।

শশাঙ্ক গুণী ছেলে। শুধু ভাল চাকরি করে আর নির্ঝঞ্ঝাট বলেই নয়, সুপুরুষ চেহারা, মিষ্টি ব্যবহার তাকে এখানকার বাঙালি মহলে জনপ্রিয় করে তুলেছে। এছাড়াও গান বাজনা নাটক এসবেও সে নিয়মিত যোগ দেয়। মোট কথা শশাঙ্ককে স্বামীরূপে পাবে জেনে সুমনা নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করে।

সুমনা অতি সাধারণ মেয়ে, অন্তত সুমনার নিজের ধারণা তাই। যদিও সুমনা গ্র্যাজুয়েট, গানে ডিগ্রি আছে। শুধু ডিগ্রির কথা বললে সুমনার গানের সব কথা বলা হয় না—সে গান গেয়ে শ্রোতাকে মহিত করে দিতে পারে। সুমনার বাবা সরকারি চাকরি করেন, বেশ সচ্ছল পরিবার, তবু সুমনার নিজেকে অতি সাধারণ মনে করার কারণ তার গায়ের রঙটা চাপা আর দাঁতটা সামান্য উঁচু। যদিও তার ডাগর চোখ দুটো খুব সুন্দর, নাক টিকলো, পানের মত মুখ, আর সবার ওপরে তার মুখশ্রীতে মিষ্টি লাবণ্য আছে। তবু তার খুঁত দুটোর জন্য সে হীনম্মন্যতায় ভোগে। আসলে সেই আঠেরো বছর থেকে পাত্রপক্ষের কাছে বারবার রিজেক্ট হতে হতে তার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে সে অতি কুৎসিত। তাই শশাঙ্ক যখন প্রথাগত মেয়ে দেখতে না এসে, একটা গানের আসরে তার গান শুনে আর দূর থেকে দেখেই পছন্দ করে ফেলল তখন সুমনা প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারে নি। বিশ্বাস যখন করতে পারল তখনো একটা আশঙ্কা মনে মনে ছিলই, কখন কোন পথে আবার প্রতিকূল বাতাস এসে আশার প্রদীপটা নিভিয়ে দিয়ে যাবে।

শশাঙ্ক নিজের পছন্দের কথা সুমনার বাবাকে জানাতে দেরী করেনি। কথা এগিয়েছে। দেনাপাওনার কথা শুরু হতে সুমনা দম বন্ধ করে পাশের ঘরে প্রহর গুণতে থাকে। কিন্তু সেখানেও শশাঙ্ক তার অমায়িক স্বভাব বজায় রাখে। বলে, দেখুন বিয়ের মধ্যে এই দেনাপাওনা ব্যাপারটাই থাকা উচিত নয়। অন্তত আমার তাই মনে হয়। একটা ছেলের সাথে একটা মেয়ের বিয়ে হবে, মানে দু'জনেই নিজেকে নিঃশেষ করে অন্যকে দান করবে সেটাই দেনা, আর দু'জন একে অপরকে উজাড় করে পাবে এই তো পাওনা।

উত্তরে সুমনার বাবা বলে, দেখ বাবা তুমি উদার মনের মানুষ তাই এমন করে বলতে পারলে। কিন্তু বিয়েতে দেনা-পাওনা তো থাকবেই।

বিয়েবাড়িতে পাঁচজন পাঁচরকমের মানুষ আসবেন তাঁরাও তো জানতে চাইবেন, মেয়ের বাপ কী যৌতুক দিলো?

— দেখুন এই বিয়েবাড়ি, বন্ধুবান্ধব, খাওয়াদাওয়া, হৈ-হুল্লোড়, এসবে আমার একটু অসুবিধে আছে। বিয়েটা রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হলে হয় না?

— রেজিস্ট্রি ম্যারেজ!

— হ্যা, রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। একদম পাকা বিয়ে। এখন তো সোসাল ম্যারেজ হলেও, রেজিস্ট্রেশান করা বাধ্যতামূলক।

— তা তো জানি। কিন্তু তাই বলে আমার একমাত্র মেয়ের বিয়েতে শাঁখ বাজবে না, সানাই বাজবে না, আত্মীয়কুটুম, বন্ধুবান্ধব আসবে না, তাই কখনো হয় নাকি? না না তা হতে পারে না।

— সে তো বুঝলাম, কিন্তু ঐ ধুমধাম করে বিয়েতে আমার একটু অসুবিধে আছে।

— অসুবিধে? কী অসুবিধে?

এবার উত্তর দিতে শশাঙ্ক একটু সময় নেয়। ম্লান হেসে বলে, আমি তো আপনাদের কাছে কোন কথাই গোপন করিনি, আপনারা সবই জানেন। আমি এর আগে উমাকে বিয়ে করেছিলাম। কোন নগদ নিইনি, আসলে নগদ নেওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না, কারণ আমি বরাবরই পণপ্রথার বিরোধী মানুষ। জমানো টাকা খরচ করে খুব ধুমধাম করে বিয়ে করেছিলাম। উমা আমার ঘরে ছিল ঠিক একবছর। এমন রোগ বাধাল, ঐ একবছরে, ডাক্তার ওষুধ পথ্যে জলের মত টাকা খরচ হয়ে গেল। যেখানে যা লোন পাওয়া যায় সব নিয়ে ফেললাম। এখন যদিও লোন প্রায় শোধ করে ফেলেছি, কিন্তু ধুমধাম করে বিয়ে করার মত টাকাপয়সা আমার হাতে নেই।

সুমনার বাবা শশাঙ্কের পিঠে হাত রেখে বলেছেন, তাতে কী হয়েছে, তোমার কতো টাকা লাগবে বলো, আমি দেব।

শশাঙ্ক আঁৎকে ওঠে, না না তা হয় না, আমি ছোট থেকেই পণপ্রথার বিরোধী হয়ে নিজের বিয়েতে পণ নেব? না না তা কিছুতেই সম্ভব নয়।

— কিন্তু আমার একমাত্র মেয়ের বিয়েতে হৈ হুল্লোড় হবে না তাও তো হয় না। তুমি নিঃসঙ্কোচে বলো কতো টাকা হলে তোমার সবদিক সামলে জাঁকজমক করে বিয়ে করতে পারবে?

— আপনি যাই বলুন, সঙ্কোচে আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে।

— আমার কথা ভেবে, আমাদের কথা ভেবে সঙ্কোচ কাটিয়ে ফেলো। বলো—

— দেখুন সবদিক বজায় রাখতে গেলে তো অনেক খরচ -

— তবু, কত?

— লাখ খানেকের কমে তো কিছুই হবে না।

— আমি তোমাকে লাখ দেড়েক দিয়ে দেব, তাহলে সোসাল ম্যারেজে আপত্তি নেই তো?

— কিন্তু, লোকে শুনলে কী বলবে বলুন তো। আমি পণপ্রথা বিরোধী হয়ে—

— লোকে না শুনলেই হল। এবার বলো, আসবাবপত্র কী লাগবে?

— এ ব্যাপারে আমি খোলাখুলি জানিয়ে দিচ্ছি, আমি বাউণ্ডুলে মানুষ আমার ঘরে কিছুই নেই। আপনার মেয়ের যা যা প্রয়োজন মনে করবেন দেবেন।

২

সুমনার বিয়ে শেষপর্যন্ত হয়ে গেল। ভাগলপুরের বাঙালি মহলে রীতিমত হৈ চৈ ফেলে দিয়ে সুমনার বিয়ে হল। দেড় লাখ টাকা বরপণের কথাটা শ্বশুর জামায়ের মধ্যে চাপা রইলো। লোকে জানল শশাঙ্ক বিনাপণে বিয়ে করেছে, তাই সবার মাঝে তার জয় জয়কার পড়ে গেল। এক গাড়ি আসবাব-খাটবিছানা, আলমারি, ড্রেসিংটেবিল, টিভি, ফ্রিজ থেকে শুরু করে রান্নাঘর বৈঠকখানা ঘরের যাবতীয় ফার্নিচারের মায় দরজা জানলার পর্দা পর্যন্ত যে সুমনার বাবা যৌতুক দিলেন সেদিকে কেউ গুরুত্বই দিল না। এ যেন, না চাহিলে যারে পাওয়া যায়-এর মত। এতো দিতেই হয়।

বাঙালি ক্লাবের সভাপতি পদাধিকার বলে বরকর্তা হলেন। আর পুরো বাঙালিক্লাব ঝাঁপিয়ে পড়ল শশাঙ্ক সুমনার বিয়েটাকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে। দুর্গাপুজোর চেয়েও বেশী হৈ চৈ এর মধ্যে দিয়ে চার পাঁচ দিন কেটে গেল। তারপর আবার বাঙালিপাড়ার জীবন নিস্তরঙ্গ হতে হতে স্বাভাবিক

হয়ে গেল। শশাঙ্কও দশদিনের ছুটি কাটিয়ে আবার চাকরিতে যোগ দিল। মর্নিং ডিউটি। ভোরবেলা উঠে সামান্য জলখাবার খেয়ে শশাঙ্ক যখন অফিসে চলে যেত, সুমনার বিশাল কোয়ার্টারটায় বড় একা একা লাগত। প্রথম প্রথম আশপাশের কোয়ার্টারের বাঙালি অবাঙালি মেয়ে-বউরা আসত গল্প করতে নতুন বউয়ের সাথে। আস্তে আস্তে দুচার দিনেই নতুন বউ পুরনো হয়ে গেল। পড়শীদের আসাযাওয়াতেও ভাঁটা পড়ল। যে যার নিজের সংসার নিয়েই ব্যস্ত, কার আর সময় আছে রোজ রোজ সুমনার সাথে গল্প করার। তাই একা একাই সারা সকালটা কাটাতে হয় সুমনাকে। দু'একদিন সকালবেলা শশাঙ্ক ডিউটি চলে যেতেই সুমনাও অটো ধরে বাপের বাড়ি গিয়েছিল, কিন্তু সেই দুএকদিনই, তারপর সুমনার নিজেরই কেমন লজ্জা করত, রোজ রোজ বাপের বাড়ি যেতে। তাই সুমনা এখন টিভি দেখে, গল্পের বই পড়ে সকালটা কাটায়।

শশাঙ্কর সকালে ডিউটির সপ্তাহটা এরকম কেটে গেল। গোল বাঁধল বিকেল ডিউটির সময়ে। শশাঙ্ক দেড়টার সময় বার হয়ে যায় ডিউটিতে, ফেরে সেই রাত সাড়ে দশটা-এগারোটায়। সুমনা ভীতু মেয়ে নয় তবুও সন্ধ্যের পর মস্ত বড় কোয়ার্টারে একা একা কেমন যেন গা ছম ছম করত। তবুও সে পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। কিন্তু তৃতীয় সন্ধ্যায় যা ঘটল তারপর সুমনার পক্ষে সন্ধ্যেবেলা একা কোয়ার্টারে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

সেদিন দুপুরটা একটা বই পড়তে পড়তে কেটে গেছে, প্রত্যাহিক অভ্যেস মত ঘুমনো হয় নি। সেই ঘুমটা এসে গিয়েছিল বিকেলবেলা। ঘুম যখন ভাঙল তখন চারদিকে অন্ধকার নামছে। অবেলায় ঘুমিয়ে শরীরে এমন জড়তা এসে গিয়েছিল যে বিছানা ছেড়ে উঠতেই ইচ্ছে করছিল না। অবশ্য ওঠার কোন তাগিদও ছিল না। সুমনা বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানলা দিয়ে দেখছিল কেমন সীসের বরণ আকাশটা একটু একটু করে কালো আরো কালো হয়ে যাচ্ছিল। উঠে গিয়ে আলোর সুইচটা দিতেও ইচ্ছে করছিল না। ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। বাইরে চারিদিকে আলো জ্বলে উঠেছে, তার

টুকরো টুকরো আলো জানলা দিয়ে ঢুকে দেওয়ালের গায়ে আলমারিতে আলোছায়ার নক্সা এঁকেছে। পরিবেশটা কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। সেই রহস্যময় পরিবেশে হঠাৎ কে পাশের ঘর থেকে ফিস ফিস করে কথা বলে উঠলো 'ওটা কে?' মহিলা কণ্ঠস্বর দীর্ঘশ্বাস মেশা কাতর ব্যাকুল প্রশ্ন 'ওটা কে?'

আওয়াজটা ভেসে এলো বৈঠকখানার দিক থেকে অথচ সুমনার স্পষ্ট মনে আছে শশাঙ্ক অফিস বার হওয়ার পর সে দরজা ভালো করে বন্ধ করেছে। আর কোয়ার্টারে ঢোকার দ্বিতীয় কোন রাস্তাও নেই তবে কে কথা বলল পাশের ঘরে? তবে কি সুমনা ভুল শুনল? না সে ভুল শোনেনি। আবার পাশের ঘর থেকে সেই দীর্ঘশ্বাস মেশা প্রশ্ন ভেসে এলো 'ওটা কে'? এবং তারপর একটু থেমে আবার প্রশ্ন 'ওটা কে গো?' এবার কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা কম ক্রুরতার ছোঁয়া।

সুমনা ভয়ে বিছানার ওপর জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে। কোনরকমে কাঁপা হাত বাড়িয়ে বেড সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দেয়। তার বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটা এতো জোরে ধড়াস ধড়াস করতে থাকে মনে হয় যেন পাঁজরের খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। হাত পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। সুমনা একদৃষ্টে বৈঠকখানার দিকের দরজার দিকে চেয়ে থাকে। পর্দাটা ফ্যানের হাওয়ায় দোল খাচ্ছে বৈঠকখানা ঘরের চাপবাঁধা অন্ধকারটা পর্দার এপাশ ওপাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে। সুমনা কি করবে ভেবে উঠতে পারে না। আর ঠিক তখন ড্রেসিং টেবিলে রাখা মোবাইল ফোনটা বেজে উঠতেই সুমনা আর একবার ভীষণ চমকে ওঠে পরক্ষণে তার পরিচিত বাজনা শুনে বুঝতে পারে ফোন এসেছে। কিন্তু উঠে গিয়ে ফোনটা ধরার মত শক্তি সঞ্চয় করার আগেই ফোনটা কেটে যায়। মিনিট খানেক নীরবতার পর ফোনটা আবার বেজে ওঠে। এবার সুমনা দেহমনের সব শক্তি এক করে কোনরকমে উঠে গিয়ে ড্রেসিং টেবিল থেকে ফোনটা তুলে নিয়ে আবার বিছানায় ফিরে আসে। ফোনে শশাঙ্কর হাসিমাখা মুখের ছবি ফুটে উঠেছে—মানে শশাঙ্কর ফোন। সুমনা কাঁপা হাতে ফোন রিসিভ করে। ওপার থেকে শশাঙ্কর গলা

ভেসে আসে—কী ম্যাডাম, কী মহাকাজে ব্যস্ত ছিলে যে ফোনটাও ধরছ না? রান্না করছিলে, নাকি টিভি দেখছিলে,না বই পড়ছিলে?

সুমনার তরফ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে শশাঙ্ক বিচলিত হয়ে পড়ে। -হ্যালো-হ্যালো-সুমনা কী হল? কথা বলছ না কেন? কথা বলো—

সুমনা কোনরকমে বলতে পারে, শশাঙ্ক, তুমি এক্ষুনি বাড়ি চলে এসো। কান্নায় সুমনার গলা বুজে আসে। শশাঙ্ক ব্যস্ত হয়ে বলে, সুমনা কী হয়েছে, কাঁদছ কেন? উত্তরে সুমনা উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলে, তুমি বাড়ি এসো। এক্ষুণি এসো, প্লিজ।

— তুমিতো জান আমাদের কাজ এমনই যখন তখন চলে যাওয়া যায় না। কি হয়েছে আমায় বলো না।

— ফোনে বলতে পারব না। আবার কান্নায় সুমনার গলা বুজে যায়।

চিন্তিত ভাবে শশাঙ্ক বলে, আমি তো যেতে পারব না, ঠিক আছে তোমার বাবাকে ফোন করে দিচ্ছি।

৩

মিনিট কুড়ি পঁচিশের মধ্যে সুমনাদের কোয়ার্টারের দরজায় ধাক্কা দিয়ে সুমনার বাবা জোরে জোরে ডাকতে থাকেন, সুমনা এই সুমনা, দরজা খোল। বাবার গলা পেয়ে সুমনার সাহস ফিরে আসে সে দৌড়ে দরজা খুলতে যায় কিন্তু বৈঠকখানা ঘরের দরজায় এসে পর্দার ওপারের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তার পা আটকে যায়। ফিরে এসে টর্চটা জ্বালিয়ে নিয়ে কোনরকমে বৈঠকখানার অন্ধকারটুকু পার হয়ে বাইরের দরজাটা খুলে দেয়। তার বাবা তার উদভ্রান্ত ভাব দেখে মাথায় হাত বুলিয়ে প্রশ্ন করেন, কী হয়েছে রে মা? তোর মুখটা অমন ফ্যাকাসে লাগছে কেন? হঠাৎ শশাঙ্ক ফোন করল তুই নাকি ফোনে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছিস, ও খুব চিন্তায় পড়ে গেছে।

সুমনা বাবার হাতটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে। বাবা অনুভব করেন সুমনার হাত দুটো থির থির করে কাঁপছে, মুখটা ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছে। সুমনাকে এতো ভয় পেতে তিনি কোনোদিন দেখেননি। সারা বাড়ির আলো জ্বালিয়ে দিয়ে অনেক সান্ত্বনা দেওয়ার পর সুমনা কিছুটা ধাতস্ত হয়। তার

কাছে সব ঘটনা শুনে তার বাবা পুরো কোয়ার্টারের সব কটা ঘর বারান্দা, খাটের তলা, আলমারির পেছন তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। কিন্তু কোন মানুষ তো দূরের কথা একটা ইঁদুর বেড়ালও চোখে পড়ল না। শেষে তিনি সুমনার মুখ চেয়ে শশাঙ্ক না ফেরা পর্যন্ত থেকে যাওয়াই ভালো মনে করলেন।

রাত এগারোটায় শশাঙ্ক ফিরতে, শ্বশুর জামাই অনেকক্ষণ আলোচনা করে ঠিক করলেন, বিকেল ডিউটির দিনগুলোতে শশাঙ্ক অফিস যাওয়ার সময় সুমনাকে বাপের বাড়ি রেখে যাবে। আবার ডিউটি থেকে ফেরার পথে সুমনাকে নিয়ে আসবে।

মাসখানেক বেশ নির্বিঘ্নেই কেটে গেল। সুমনা প্রায় ভুলেই গেল সেই অভিশপ্ত দিনটার কথা। সেই দীর্ঘশ্বাস, সেই অমানবিক কণ্ঠস্বরের কথা। বেশ আনন্দে হাসি গল্প মজায় কাটছিল দিনগুলো। সেদিন শশাঙ্কর মর্নিং ডিউটি ছিল। বিকেলে শশাঙ্কর বন্ধু বিভাস সস্ত্রীক এসে হাজির হল। ঘন্টা দু'য়েক চুটিয়ে আড্ডা মেরে বিভাসরা যখন যাবে বলে বার হল তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে। শশাঙ্ক যখন বলল, আমি ওদের বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে আসছি, তখন সুমনা হাসিমুখেই সায় দিয়েছিল। ওরা বেরিয়ে যেতে যেই সুমনা চায়ের কাপডিসগুলো গুছিয়ে নিয়ে বাইরের ঘরে থেকে রান্নাঘরের দিকে যেতে যাবে ঠিক তখনই হঠাৎ কারেন্ট চলে গেল। সুমনা যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল অন্ধকারে যেতে গিয়ে যদি সৌখিন কাপডিসগুলো কোথাও ঠোকাঠুকি লেগে ভেঙে যায়—তার চেয়ে কাপডিসগুলো এখানেই একপাশে নামিয়ে রেখে ঘর থেকে মোমবাতিটা জ্বালিয়ে নিয়ে আসা ভালো। হাতের কাপডিসগুলো আন্দাজে ঘরের দেওয়াল ঘেঁসে রেখে মুখ তুলতেই, কূপকূপে অন্ধকারের মধ্যে নিজের একাকীত্ব অনুভব করে সুমনার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। মাসখানেক আগের সেই সন্ধ্যের কথা মনে পড়ে যায়। এই সেই বৈঠকখানা ঘর। এ ঘরে শশাঙ্কর আগের বউ উমার একটা ফটো টাঙানো আছে। সুমনার অজান্তেই তার চোখ চলে যায় সেই ফটোর দিকে। সুমনা শিহরিত হয়ে দেখে অন্ধকারে জ্বলজ্বলে চোখ মেলে উমা তার দিকে তাকিয়ে আছে। সুমনার সারা দেহ কাঁপতে থাকে, সে চিৎকার

করতে যায় কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বার হয় না। আর ঠিক তখনই সুমনা শুনতে পায় দীর্ঘশ্বাস মেশা সেই একই জিজ্ঞাসা, "ওটা কে"? সুমনার বুঝতে অসুবিধে হয় না এ কণ্ঠস্বর অতৃপ্ত উমার। অন্ধকারে যেন উমার দীর্ঘশ্বাসের ঝাপটা এসে লাগে সুমনার গায়ে। একটু থেমে ক্রুর স্বরে প্রশ্ন, ওটা কে গো?

যে সৌখিন কাপড়িসগুলো ভেঙে যাওয়ার ভয়ে সুমনা উতলা হচ্ছিল তার অচৈতন্য দেহটা সেই কাপড়িসের গোছার ওপরেই আছড়ে পড়ে।

৪

প্রিন্স যখন বলল, পরীক্ষার পর ভাবছি মাসিমার বাড়ি বেড়াতে যাব, তখন ভিক্টর আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, তোর মাসির বাড়ি কোথায় রে? প্রিন্স প্রশ্ন করেছিল কেন, তুই যাবি নাকি? ভিক্টর লাজুক হেসে বলেছিল, যদি নিয়ে যাস—প্রিন্স কোন উত্তর না দিয়ে ওর পিঠে আদর করে একটা চড় মেরেছিল।

ভিক্টর আর প্রিন্স একই ক্লাসে পড়ে এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। তবুও প্রাত্যহিক পরিচয়ে মনে হয় যেন প্রিন্স ভিক্টরের বড় ভাই, লোকাল গার্জেন। সবসময় ওকে আগলে চলে। গত বছর গিরিডি বেড়াতে গিয়ে তিন খুনের আসামিকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে প্রিন্স আর ভিক্টর বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে। তার আগে গ্রামে পাতালভেদী শিবের রহস্য ভেদ করে আর বন্ধুকে গুপ্তধন উদ্ধার করে দিয়ে ওরা সেই ছোটবেলা থেকেই নিজেদের পরিচিত মহলে খ্যাতিলাভ করেছিল। ওদের খ্যাতির কথা প্রিন্সের মাসতুতো ভাই রাজা মারফত রাজার বন্ধু মহলে ভালোরকম ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই প্রিন্স আর ভিক্টর ভাগলপুর পৌঁছতেই রাজার বন্ধুরা একে একে এসে ভিড় জমিয়েছে প্রিন্স-ভিক্টরকে দেখতে, ওদের সঙ্গে ভাব জমাতে। এমনকি দু-এক বন্ধুর অতি উৎসাহী বাবা-মাও ছেলের সঙ্গে চলে এসেছ ওদের দেখতে। কত অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, কতো বিচিত্র আবদার শুনতে হয়। ভিক্টরের মনে মনে বেশ গর্ব হয়, এমন উৎসাহ তাদের গ্রামের মানুষের মধ্যে কোনদিন দেখেনি।

ওদের ঘিরে গড়ে ওঠা ভিড় কাটতে সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। সন্ধ্যের মুখে যখন পুরো ফাঁকা হয়ে গেল প্রিন্সের

মাসতুতো ভাই রাজার এক বন্ধু সৌরভ হঠাৎ বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করল, তোমরা ভূত বিশ্বাস করো?

প্রিন্স সপ্রতিভভাবে উত্তর দিল, নিশ্চয়ই।

ভিক্টর অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, কিন্তু তোকেতো কোনদিন ভয় পেতে দেখিনি!

—ভূতকে ভয় পাবার কী আছে?

ভিক্টর মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, এই শুরু হল তোর হেঁয়ালি। ভূত বিশ্বাস করিস অথচ ভূতকে ভয় পাস না, এ আবার কীরকম কথা?

প্রিন্স আবার হেঁয়ালি করে, আমরা তো বর্তমানে ভূতের ওপর দাঁড়িয়ে—

প্রিন্সের কথা শেষ হয় না, রাজা লাফ মেরে উঠে দাঁড়ায়, ওরে বাবারে কোথায় ভূত! বলে চারদিকে খুঁজতে থাকে। সৌরভ আর ভিক্টর রাজার মত লাফিয়ে না উঠলেও, উঠে দাঁড়ায়। তাদেরও চোখে মুখে ভয়ের ছাপ। প্রিন্স উঠে গিয়ে বারান্দার আলোর সুইচটা টিপে দেয়। একটু একটু করে জমে ওঠা অন্ধকারের স্তূপটা এক নিমেষে গলে যায়। প্রিন্স নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসে পড়ে, বাকি তিনজনকে বলে, বোস বোস। তোমরাতো আমার কথাটা শেষ করতেই দিলে না। আমি বলছিলাম, আমরাতো বর্তমানে ভূতের ওপর দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ গড়ছি।

এইবার কথাটা ভিক্টর ধরে ফেলে। হাজার হোক সে তো প্রিন্সের সঙ্গে কম দিন মিশছে না। সেই ক্লাস টু থেকে দুজনের বন্ধুত্ব। তাছাড়া প্রিন্সের মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি না হলেও ভিক্টরের বুদ্ধি ভোঁতা তো নয়। ভিক্টর নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে প্রিন্সের পাশে বসতে বসতে বলে, আমরা মোটেই 'ভূত' অর্থে অতীতকে বোঝাতে চাইনি। আমরা জানতে চেয়েছি সাধারণভাবে যাকে ভূত বলা হয় সেই অতৃপ্ত আত্মার কথা। যারা মানুষকে দেখা দেয়, ভয় দেখায়, সেই ভূতের কথা।

প্রিন্স মিচকে হাসে, বলে জানি, তোরা কোন ভূতের কথা জানতে চেয়েছিস, তা আমি বেশ জানি। আমি শুধু একটু কথা নিয়ে খেলছিলাম।

একটু থেমে গম্ভীরভাবে বলে, দেখ এই ভূতের ধারণা কোন দুটো মানুষের এক নয়। সবারই একটা স্বরচিত ধারণা থাকে, তা সে ভূত বিশ্বাসীই হোক আর অবিশ্বাসীই হোক। তবে আমার মনে হয় যত বড় অবিশ্বাসীই হোক প্রতিটি মানুষের মনের কোণে অতি সামান্য হলেও ভূতের প্রভাব আছেই। এবার ফিরে আসি সৌরভের কথায়—তুমি হঠাৎ ভূতের প্রসঙ্গ তুললে কেন? নিশ্চয়ই তোমার বা তোমাদের বাড়ির কারো সম্প্রতি কোন ভৌতিক অভিজ্ঞতা হয়েছে?

সৌরভ আর রাজা খুব অবাক হয়ে যায়। প্রায় একসাথেই প্রশ্ন করে, তুমি কী করে জানলে?

ভিক্টর বিজ্ঞের মত বলে, খুব সোজা, আমরা একটু আধটু গোয়েন্দাগিরি করি সে খবর তোমাদের অজানা নয়। আর আমাদের একান্তে পেয়ে প্রথমেই সৌরভ যখন ভূতের প্রসঙ্গ তুলেছে, তখন বুঝে নিতে হবে নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন কারণ আছে।

ভিক্টর আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল প্রিন্স তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, বলো সৌরভ, এই সন্ধ্যেবেলা একটু ভূতের গল্প শোনা যাক, জমবে ভালো।

সৌরভ শুরু করে, আমার দিদি সুমনার মাস দেড়েক আগে বিয়ে হয়েছে। সৌরভ সুমনার কাহিনী বলে যায়। প্রিন্স আর ভিক্টর মন দিয়ে শোনে। প্রিন্সের মুখ দেখে বোঝা যায় না সে ভয় পাচ্ছে কিনা, তবে ভিক্টর যে মাঝে মাঝে শিহরিত হচ্ছে বেশ বোঝা যায়। সৌরভের বলা শেষ হতে প্রিন্স বলে, তোমার জামাইবাবুর সাথে একবার আলাপ করা যাবে?

— কেন যাবে না! জামাইবাবু খুব আলাপী মানুষ, লোকজনের সাথে মিশতে ভালোবাসেন। তোমাদের নিয়ে গেলে খুব খুশী হবেন।

— ওনার এখন কি ডিউটি চলছে?

— ইভিনিং ডিউটি। আমরা কাল সকালেই যেতে পারি।

— সেই ভালো। তবে আগে থেকে কাউকে কিছু বলার দরকার নেই, তাতে অকারণ গুরুজনেরা ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আমরা এমনিই বেড়াতে বেড়াতে ঘুরে আসব।

ভিক্টর এতক্ষণ মন দিয়ে ওদের কথা শুনছিল, এবার একটু বিচলিতভাবে বলে, তুই কি এবার ভূতের পেছনে লাগবি নাকি? প্রিন্স কোন উত্তর না দিয়ে একটুখানি হাসি দিয়ে তার সম্মতি জানিয়ে দেয়। ভিক্টর শাসনের সুরে বলে, তোর তো সাহস মন্দ নয়, ভেবে দেখ, এ কিন্তু চোর ডাকাত নয়, ভূত—মানে পেত্নী বাগে পেলেই ঘাড় মটকে দেবে। প্রিন্স শান্তভাবে বলে, দেখাই যাক না কী হয়।

৫

প্রিন্স সন্ধ্যেবেলা যেরকম উৎসাহ দেখল সকালে উঠে তার আর তেমন তাড়া দেখা গেল না। সৌরভ, রাজা বেশ কয়েকবার তাকে মনে করিয়ে দিল সুমনার কোয়ার্টারে যাবার কথা। কিন্তু প্রিন্স নানা অছিলায় দেরী করতে করতে পুরো সকালটাই কাটিয়ে দিল। রাজা আর সৌরভ, প্রিন্সের হাবভাব দেখে হতাশ হয়ে অনুমান করল, ও নিশ্চই ভয় পেয়েছে। ভিক্টর যখন দেখল এগারোটা বেজে গেল অথচ প্রিন্স যাবার নাম করছে না তখন কিছুটা আশ্বস্ত হল, তাহলে বোধহয় প্রিন্স কেসটা নিচ্ছে না। ঠিক তখনই প্রিন্স ভিক্টরকে তাড়া লাগায়, তাড়াতাড়ি স্নান খাওয়া সেরে নে, সৌরভের দিদির বাড়ি যেতে হবে না?

ঠিক সাড়ে বারোটায় চারজনে বার হল সৌরভের দিদির বাড়ির উদ্দেশ্যে। সৌরভ একটু খুঁত খুঁত করে, আমরা যখন পৌঁছব তখন জামাইবাবুর অফিস বেরনোর সময় হয়ে যাবে। ভালো করে কথাই বলা যাবে না।

প্রিন্স দুঃখিত ভাবে বলে, সত্যি আমাদের আর একটু আগে বার হওয়া উচিত ছিল। বড্ড দেরী হয়ে গেল। ভিক্টর প্রিন্সকে দোষারোপ করে, দেরী তো করলি তুই। সকালে জলখাবার খেয়ে ঘুরে আসা যেত।

প্রিন্স ভিক্টরের কথার কোন জবাব না দিয়ে সৌরভকে বলে, আমরা শুধুই তোমার বন্ধু তোমার জামাইবাবুর কাছে এর বেশী কোন পরিচয় দেয়ার দরকার নেই। সৌরভ ঘাড় নেড়ে বাধ্য ছেলের মত প্রিন্সের কথা অনুমোদন করে।

ওরা যখন পৌঁছল তখন শশাঙ্কবাবু খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। দরজা খুলে সৌরভকে দেখে সাদর আমন্ত্রণ জানান, এসো শালাবাবু এসো। তারপর বাকি তিনজনের দিকে চোখ বুলিয়ে বলেন, এদের তো ঠিক চিনতে পারলাম না।

—এরা আমার বন্ধু, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে। বলে সৌরভ একে একে তিন জনের নাম বলে পরিচয় করিয়ে দেয়। শশাঙ্কবাবু আপ্যায়ন করে চারজনকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসতে দেন। তারপর ব্যস্ত হয়ে বলেন এমন সময় এলে বড় কুটুম, কী দিয়ে যে তোমাদের আপ্যায়ন করি?

প্রিন্স বলে, আপনি আমাদের জন্যে ব্যস্ত হবেন না। আমরা সবেমাত্র দুপুরের খাওয়া সেরে আসছি।

— তা বললে কি হয়? বড় কুটুম আর তার বন্ধুবান্ধব বলে কথা! দাঁড়াও তোমাদের জন্যে কোল্ড ড্রিংক্স নিয়ে আসি। সামনেই দোকান, যাব আর আসব।

এবার সবাই একসাথে প্রতিবাদ করে ওঠে। সৌরভ বলে, আমরা তো এলাম আপনার সাথে গল্প করতে—রাজা সৌরভের অসমাপ্ত কথাটা শেষ করে,—আর আপনি খালি পালাই পালাই করছেন কেন? ভিক্টর বলে, আমাদের একটু রেডিও-স্টেশনের কথা বলুন না! কীরকমভাবে লাইভ টেলিকাস্ট হয়? আর রেকর্ডিং-ই বা কেমন করে হয়? প্রিন্স প্রশ্ন করে, আচ্ছা ভাগলপুর আসার আগে আপনি কোথায় কোথায় ছিলেন? তার মধ্যে কোন রেডিও-স্টেশনটা সবচেয়ে বড়?

শশাঙ্কবাবু চারজনের প্রশ্নবানে জর্জরিত হয়ে সোফায় বসে পড়েন। হেসে বলেন, রেডিও-স্টেশন সম্পর্কে তোমাদের অনেক জিজ্ঞাসা, না? ঠিক আছে, আজ আমি তোমাদের জন্যে পারমিশান করে রাখব। কাল এইরকম সময়ে চলে এসো, পুরো রেডিও-স্টেশন ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব।

প্রিন্স লাজুক হেসে বলে, আমার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু পেলাম না।

— তুমি কী প্রশ্ন করেছিলে?

— এর আগে আপনি কোন কোন রেডিও-স্টেশনে কাজ করেছেন? তার মধ্যে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে ভালো কোনটা?

— আমি প্রথমে চাকরিতে ঢুকে পোস্টিং পেয়েছিলাম শিলং-এ। ওখানে রেডিও-স্টেশনটা খুব একটা বড়ো নয়, তবে জায়গাটা দারুণ সুন্দর! চারটে বছর ওখানে খুব মজায় কাটিয়েছি। তারপর ট্রান্সফার হয়ে ভুবনেশ্বরে গেলাম। ওখানে রেডিও-স্টেশনটা বেশ বড়। ওখান থেকে গেলাম গৌহাটি তারপর এই ভাগলপুরে।

হঠাৎই প্রিন্স প্রসঙ্গ পাল্টে সামনের দেওয়ালে টাঙানো ফটোটা দেখিয়ে প্রশ্ন করে, জামাইবাবু, ঐ ফটোটা কার? প্রিন্সের প্রশ্ন শুনে বাকি তিনজনে মুখ চাওয়া-চায়ি করে। কালকে সৌরভের গল্পে এই ছবির প্রসঙ্গ এসেছে, এছবি কার ওরা জানে। প্রিন্সেরও অজানা নয়। তবু এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ তোলায় তিনজনেই মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না। প্রশ্ন শুনে শশাঙ্কবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, উনি আমার প্রথমা স্ত্রী উমা, স্বর্গে গেছেন। ঘরের আবহাওয়াটা ভারী হয়ে ওঠে, সবাই চুপচাপ। শশাঙ্কবাবু সোফা থেকে উঠে পায়চারি করতে শুরু করেন। আবহাওয়াটা ভারী করে তোলার জন্য ভিক্টর মনে মনে প্রিন্সের ওপর রাগ করে। কী দরকার ছিল অপ্রিয় প্রসঙ্গটা তোলার। শশাঙ্কবাবু পায়চারি করতে করতে লম্বা বৈঠকখানা ঘরের শেষপ্রান্তের জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। উদাস দৃষ্টি জানলা পেরিয়ে অনেক দূর চলে গেছে। প্রিন্স ইশারায় বাকি তিনজনকে উঠতে নিষেধ করে, বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে শশাঙ্কবাবুর পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। শুনতে পায় শশাঙ্কবাবু বিড়বিড় করছেন, উমা-বিদিশা-রেবা-সুমনা — তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন নাঃ! আর না, এবার তরী ঘাটে বাঁধতে হবে।

প্রিন্স শশাঙ্কবাবুর কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে প্রশ্ন করে, বিদিশা, রেবা এরা কে জামাইবাবু? শশাঙ্ক চমকে পেছন ফিরে তাকান, ঠিক পেছনেই প্রিন্সকে দেখে আর একবার চমকে ওঠেন। অসংলগ্নভাবে বলেন, না কৈ কেউ নয়তো! তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেন, ইস অনেক দেরী

হয়ে গেল। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলেন, আমাকে তো ভাই এবার অফিস বেরতে হবে। ওরা চারজন ঘটনার আকস্মিকতায় বিদায় সম্ভাষণ জানাতেও ভুলে যায়। দরজা খুলে বার হতে হতে শশাঙ্ক বলে, সৌরভ ভাই যাবার সময় তালা দিয়ে চাবিটা তোমাদের বাড়ি রেখে দিও। আমি অফিস থেকে ফেরার পথে নিয়ে নেব। আসি ভাই।

শশাঙ্কবাবুকে হঠাৎ ওরকম উদ্ভ্রান্তভাবে চলে যেতে দেখে তিনজনে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে প্রিন্সের দিকে তাকায়। প্রিন্স বুঝতে পারে তার আর শশাঙ্কর ফিসফিস কথাগুলো ওদের কানে পৌঁছয়নি। সেও কোন কথা প্রকাশ করে না। শুধু ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে সবাইকে চুপচাপ বসে থাকার নির্দেশ দিয়ে নিজেও একটা সোফায় বসে পড়ে।

শশাঙ্কবাবু বেরিয়ে যেতে প্রিন্সের মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে। ঠিক উমাদেবীর ফটোর সামনাসামনি বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ফটোটার দিকে। তারপর যে দরজা দিয়ে শশাঙ্কবাবু চলে গেছেন সেই দরজার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে। বিড় বিড় করে বলে, একেই বলে স্লিপ অফ ট্যাং।

বাকি তিনজনের পেটে এক কাঁড়ি প্রশ্ন জড়ো হয়ে জট পাকিয়ে যায়। কেউ কোন প্রশ্ন করার আগেই প্রিন্স ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে তাদের এখনো চুপচাপ থাকার নির্দেশ অব্যাহত রাখে। শশাঙ্কবাবু বেরিয়ে যাওয়ার মিনিট পনেরো বাদে প্রিন্স উঠে দাঁড়ায়। বাইরের দরজাটা খুলে একবার বাইরে ঘুরে আসে। যখন নিশ্চিত হয় শশাঙ্ক সত্যি সত্যিই অফিসে চলে গেছে, ভেতরে এসে বাইরের দরজা বন্ধ করে দেয়। বাকি তিনজনকে নির্দেশ দেয়, বি ক্যুইক, ডাইনিং স্পেস থেকে টেবিলটা নিয়ে এসো তো। টেবিল আসতে টেবিলের ওপর উঠে আরো একবার উমা দেবীর ফটোটা ভালো করে নিরীক্ষণ করে। ফটোটা নামিয়ে আনবে বলে টানতেই একটা ছোট ভারি জিনিস ফটোর পেছন থেকে পড়ে যাওয়ার মুখে অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় প্রিন্স সেটা লুফে নেয়। প্লাষ্টিক কাগজ মোড়া জিনিসটা একবার দেখেই প্রিন্স সেটাকে প্যান্টের পকেটে পুরে ফেলে। তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ফটোটা নামিয়ে প্রিন্স দুহাত আড়াল দিয়ে কী যেন দেখে বলে, ভূত ধরা পড়ে গেছে। এতো সহজে যে ধরা পড়ে যাবে আশাই করিনি।

ভিক্টর আর চুপ করে থাকতে পারে না। বলে, কোথায় ভূত, দেখি!

— প্রিন্স বলে এখন নয় রাত সাড়ে দশটায় যখন শশাঙ্কবাবু সৌরভদের বাড়ি আসবেন তখন ঝুলি থেকে ভূত বেরবে।

৭

রাত সাড়ে দশটা। সুমনাদের বাড়ির বাইরের ঘর জমজমাট। সুমনা, সুমনার বাবা মা ভাই তো আছেই, রাজা, ভিক্টর, প্রিন্সও আছে। প্রিন্সের মাসিমা মেসোমশাইও এসেছেন প্রিন্সের কেরামতি দেখতে। সবাই জেনে গেছে সুমনাদের কোয়ার্টারের ভূত ধরা পড়ে গেছে প্রিন্সের হাতে। এখন অপেক্ষা শুধু শশাঙ্কর জন্য। ও এলেই প্রিন্স ঝুলি থেকে ভূতটাকে বার করবে।

সবাই অপেক্ষা করে বসে থাকে একজনের জন্যে, শশাঙ্ক আসবে। তাকে আসতেই হবে কোয়ার্টারের চাবি নিতে। দশটা পঁয়ত্রিশ। প্রিন্স অস্থির হয়ে পড়ে। কূলে এসে তরী ডুববে না তো? না না পালাবে কোথায়, তার টিকি তো বাঁধা আছে ভাগলপুর রেডিও-স্টেশনে। অবশেষে দশটা চল্লিশে বাইরের দরজায় কড়া নড়ে ওঠে। শশাঙ্ক ঘরে ঢুকে, একসঙ্গে এতো লোক দেখে ঘাবড়ে যায়। সৌরভকে বলে কোয়ার্টারের চাবিটা দাও, বাড়ি যাই। অনেক রাত হল।

প্রিন্স খালি চেয়ারটা দেখিয়ে বলে, বসুন না জামাইবাবু, একটু গল্প করা যাক।

প্রিন্সকে দেখে শশাঙ্কর অস্বস্তি বেড়ে যায়। আমতা আমতা করে বলে, আজ অনেক রাত হয়েছে, আজ থাক না, কাল না হয়—

এবার প্রিন্সের গলায় আদেশের সুর, না কাল নয়, আজ, এখন। বসুন চেয়ারে।

শশাঙ্ক কাঁচুমাচু মুখে চেয়ারে বসে পড়ে মাথা নিচু করে। প্রিন্স দরজার পাশের চেয়ারটায় বসে বলে, আমি একটা গল্প বলছি কোথাও ভুল হলে সংশোধন করে দেবেন জামাইবাবু।

আজ থেকে তের চোদ্দ বছর আগে একটা ছেলে আকাশবাণীতে এ্যাসিসটেন্ট ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ার পদে চাকরি পেল। ভালো চাকরি,

ভালো ছেলে, কাজেই অনেক মেয়ের বাপ জুটে গেল পেছনে। দেখে শুনে ভালোরকম টাকা পয়সা জিনিসপত্র নিয়ে বিয়ে করল ছেলেটা। কিন্তু দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্য—এক বছরের মধ্যেই মারা গেল বউটা।

প্রিন্স থামল। শশাঙ্কর দিকে ঝুঁকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল, বউটা মারা গেল, নাকি মেরে ফেলা হল শশাঙ্কবাবু?

শশাঙ্ক কাতরভাবে বলে, বিশ্বাস করো উমা অসুখে মারা গিয়েছিল।

— ঠিক আছে সে না হয় বিশ্বাস করা গেল। কিন্তু তারপর? তারপর ছেলেটা ট্রান্সফার হয়ে গেল ভুবনেশ্বরে। সেখানে আবার মেয়ের বাপেদের খেলিয়ে খেলিয়ে বিদিশাকে বিয়ে করল যথারীতি মোটা অঙ্কের টাকা এবং অঢেল জিনিসপত্র নিয়ে। অবশ্য আগের বউ মারা যাবার কথা গোপন করল না। এদিকে দুবার যৌতুক পেয়ে ছেলেটার মনে তখন টাকার নেশা ধরে গেছে। কিন্তু সবাই তো উমা নয় যে একবছরের মধ্যে মরে গিয়ে তার রাস্তা পরিষ্কার করে দেবে। তাই বিদিশাকে ভয় দেখান হল, ভূতের ভয় উমার ভূতের ভয় এবং তাতে কাজ হল। ছেলেটা যখন গৌহাটি বদলি হল বিদিশা কিছুতেই তার সঙ্গে যেতে চাইল না। বিনা শর্তে বিনা ক্ষতিপূরণে ডিভোর্স চাইল। এরপর গৌহাটিতে রেবাও একইভাবে প্রতারিত হল। এবার এই ভাগলপুরে সুমনাদির পালা। আমি বাজি রেখে বলতে পারি বছরখানেক বাদে যখন আবার ট্রান্সফার অর্ডার আসত তখন সুমনাদি কখ্খনো ওর সঙ্গে যেতে রাজি হত না নতুন জায়গায়। কাজেই দুঃখী দুঃখী মুখ করে আবার একটা ডিভোর্স পেপার সই করত দুজনে। আর মেসোমশাইও নিশ্চয়ই পণের টাকা বা আসবাবপত্র ফেরত চাইতে পারতেন না। কারণ শশাঙ্কবাবু তো কিছু চায়নি সবইতো উনি যেচে দিয়েছেন।

এবার বলি সুমনাদির জন্যে কী কী ভৌতিক ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেই কথা। প্রথম উমাদেবীর ফটো—ভাই সৌরভ ফটোটা একটু আমাকে দেবে। ফটোটা হাতে নিয়ে প্রিন্স বলে, ঘরের আলোটা একটু নেভাতে হবে। আলো নিভতেই ঘরের সবাই রোমাঞ্চিত হয়ে দেখে উমা দেবীর চোখ দুটো জ্বলছে। এতো জনের মধ্যে বসেও সুমনা, ও বাবা গো। বলে চিৎকার করে ওঠে। প্রিন্স ঘরের আলো জ্বেলে দেবার নির্দেশ দিয়ে সুমনাকে বলে, ভয়

পেও না সুমনাদি, এ কোন ভৌতিক ব্যাপার নয় ফটোর চোখের তারা দুটোয় সম্ভবত ফসফরাস জাতীয় কিছু লাগান আছে তাই অন্ধকারে অমন জ্বলছে, এর থেকেও চমকে ওঠার মত জিনিস হল ভূতের কণ্ঠস্বর। ভিক্টর, একবার ভূত কে ডাক তো।

ভিক্টর পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বার করে দুচারটে সুইচ টিপে অপেক্ষা করতে থাকে। ক'এক সেকেণ্ড নীরবে কেটে যায় তারপর ঘরের সবাইকে চমকে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার আওয়াজ হয় তারপর শোনা যায় নারী কণ্ঠের বিস্ময় ভরা প্রশ্ন, ও কে? ঘরের আট দশটা মানুষ উজ্জ্বল আলোর মধ্যে বসেও কেঁপে ওঠে সে কণ্ঠস্বর শুনে। এই কণ্ঠস্বরের কথা সবাই সুমনার কাছে শুনেছে আজ নিজে কানে শুনে অনুমান করতে পারে অন্ধকার বাড়িতে একা এ কণ্ঠস্বর শোনার অভিজ্ঞতা কেমন হতে পারে। ততক্ষণে ভৌতিক কণ্ঠ ক্রুর স্বরে বলে, ও কে গো?

সুমনা মাকে জড়িয়ে ধরে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। প্রিন্স তার কাছে এগিয়ে যায় বলে, সুমনাদি ভয় পেও না এটা উমাদেবীর কণ্ঠস্বর নয়, ভৌতিক কণ্ঠস্বরও নয়। পকেট থেকে একটা অত্যাধুনিক মডেলের মোবাইল ফোন বার করে সুমনার দিকে এগিয়ে ধরে, এই কণ্ঠস্বর হল এই ফোনের রিংটোন।

৮

এরপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। মাথা নিচু করে বসে থাকা শশাঙ্ক কান্নায় ভেঙে পড়ে। সুমনার বাবার হাতে পায়ে ধরে বার বার ক্ষমা চায়। প্রিন্স যখন বলে, বিদিশা আর রেবাকে তাদের হারানো সংসার তো ফিরে দিতে পারবেনা না অন্তত নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে আর ক্ষতিপূরণ দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। তখন শশাঙ্ক প্রিন্সের হাত ধরে বলে, তুমি যেমনভাবে বলবে আমি তেমনভাবেই ক্ষমা চাইতে রাজি আছি। তুমি যা ক্ষতিপূরণ দিতে বলবে আমি তাই দেব।

ঘরের সব লোক যেন পাথরের মূর্তির মত বসে নাটক দেখছিল। সবার সম্বিত ফেরে সুমনার ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠার আওয়াজে। কাউকে কোন সান্ত্বনা দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে সুমনা দোতলায় নিজের ঘরে গিয়ে খিল দেয়।

সূচীপত্র (দ্বিতীয় পর্ব)

...ছয় ভূতের গল্প

এক		ডাকুর বন্ধু	পৃষ্ঠা	৭৯
দুই		মীরণের শেষ সময়	পৃষ্ঠা	৮৫
তিন		পুবের ঘর	পৃষ্ঠা	৯২
চার		অবিশ্বাস্য	পৃষ্ঠা	১০৩
পাঁচ		ভূতের আড্ডা	পৃষ্ঠা	১১০
ছয়		প্রতিষেধক	পৃষ্ঠা	১১৬

ডাকু খুব ডাকাবুকো ছেলে। আসলে ডাকাবুকো ছেলে বলেই ছোটবেলায় ঠাকুমা আদর করে ডাকতেন 'ডাকু' বলে। সেই থেকে ঠাকুমার দেওয়া নামটা রয়েই গেছে। এখন ডাকু বড় হয়েছে। ক্লাস সিক্সে পড়ে। ডানপিটেমি অনেকটাই কমে গেছে পড়াশোনার চাপে। তবে বুক ভরা সাহসটা কিন্তু রয়েই গেছে। তাই, বাবা যখন জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রে, মাস্টারমশায়ের কাছে পড়ে অত রাতে একা একা এতটা পথ ফিরতে পারবি তো?' ডাকু সদম্ভে ঘাড় নেড়েছিল 'হাঁ' বোঝাতে।

নভেম্বরের শেষ, পুজোর ছুটির পর স্কুল খুলেছে, পড়াশোনা শুরু হয়েছে পুরোদমে, তাই মাস্টারমশায়ের কাছ থেকে ছাড়া পেতে ন'টারও বেশী রাত হয়ে গেল। ডাকুর সাথে, আর যে সাত জন পড়ে তারা সকলেই বড় রাস্তা ধরে দক্ষিণে যাবে, একমাত্র ডাকুকেই বড় রাস্তা ছেড়ে পুবের ইট বাঁধান রাস্তা ধরতে হল। দূরে দূরে এক-একটা বাগান ঘেরা বাড়ি পেরিয়ে পেরিয়ে ডাকু পৌঁছল গ্রামের শেষ প্রান্তে। এবার একটা বড় মাঠ পড়বে, মাঠ পেরলে শুরু হবে ডাকুদের গ্রাম। ডান দিকের এক পুকুরকে

অর্ধচন্দ্রাকারে ঘুরে রাস্তাটা মাঠের দিকে গেছে। বাঁয়ে একটা পাতলা বাঁশ ঝাড়, হাওয়ায় বাঁশে বাঁশে ঘষা লেগে 'কট্ কট্ কট্' করে আওয়াজ হচ্ছে। শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ বাঁশ ঝাড়ের ফাঁক ফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। মাঠের ওপারের চাঁদোয়া আকাশের দিগন্ত রেখার ওপর ঝুলে আছে চাঁদটা। ডাকুর শীত শীত করে, চাদর দিয়ে ভালো করে মুড়ে নেয় দেহটাকে। হঠাৎ মনে হয় ডান পাশে কে যেন তার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। ডাকু ডান দিকে টর্চের আলো ফেলে। কিন্তু কাউকে দেখতে পায় না। গা-টা শির্ শির্ করে ওঠে। ডাকু মনকে প্রবোধ দেয় ওসব মনের ভুল। কিন্তু পরক্ষণেই বেশ বুঝতে পারে বাঁ পাশে তার গা ঘেঁসে কে যেন হাঁটছে তার সঙ্গে সঙ্গে। ডাকু ভয়ে ভয়ে বাঁ দিকে টর্চের আলো ফেলে। কিন্তু এবারেও কাউকে দেখতে পায় না। এখন ডাকুর বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। হৃৎপিণ্ডের দামামা সে যেন নিজের কানে শুনতে পাচ্ছে। ভয়ে কেঁপে ওঠা হাঁটু দুটোকে বশে এনে, ডাকু আরো জোরে জোরে পা চালায়। এবার পায়ের আওয়াজ আসে ঠিক তার পিছন থেকে। ডাকু টর্চটা ঘুরিয়ে পেছনে দেখতে যায়, কিন্তু কেন কে জানে, টর্চটা জ্বলে না। ডাকু পিছন ফিরে মরা চাঁদের আলোয় দেখল, ঠিক তারই বয়সী একটা হাফ্ প্যান্ট পরা ছেলে তার পিছনে দাঁড়িয়ে। মুখের সামনে দু'টো হাত নেড়ে ছেলেটা বলল, 'টর্চ জ্বেলো না, প্লীজ।' ডাকু দেহ মনের শেষ শক্তি জড় করে প্রশ্ন করে, 'কে তুমি?' ছায়ামূর্তি উত্তর দেয় 'আমি ভূত।'

ডাকুর মনে হয় এবার সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। পা দুটো যেন মাটির সাথে গেঁথে গেছে। নড়বার মত শক্তি আর দেহে অবশিষ্ট নেই। ডাকুকে চুপ করে থাকতে দেখে ছায়ামূর্তি আবার বলে, 'কী ডাকু, ভয় পেলে?' আমাকে বিশ্বাস করো তোমার কোন ক্ষতি আমি করব না। আসলে তোমাদের কোন ক্ষতি, কোন অনিষ্ট করার সাধ্যই নেই আমাদের। আমাদের দেখে ভয় পেয়ে তোমাদের নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করে বসো, আর দোষটা পড়ে আমাদের ঘাড়ে। আমরা কিন্তু কিছুই করি না।' এত কথা বলার পরেও ডাকুর কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে ভূত অভিমানী গলায় বলে, 'তবুও ভয় কাটছে না? তুমি সাহসী ছেলে বলেই কিন্তু তোমার সাথে ভাব

করতে, বন্ধুত্ব করতে এসেছিলাম। আসলে বড্ড একা একা লাগে তাই...' ছায়ামূর্তির দীর্ঘশ্বাস পড়ে, 'তুমি যদি বন্ধুত্ব করতে না চাও আমার কিছু করার নেই। আমি চলে যাচ্ছি, আর কখনো তোমাকে বিরক্ত করব না।'

হঠাৎই ডাকুর মুখে ভাষা ফোটে, সে অনুনয়ের সুরে বলে, 'তুমি যেও না।' ছায়ামূর্তি খুব খুশি হয়ে বলে, 'চলো তাহলে গল্প করতে করতে তোমাকে মাঠের ওপার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।' ডাকুর সাহস আস্তে আস্তে ফিরে আসে, স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করে, 'তোমার নাম কী?'

— আমাদের তো ভাই কোন নাম থাকে না, তুমি তোমার পছন্দসই একটা নাম দিয়ে দাও।

—আমি তোমায় ভুতু বলে ডাকব, রাগ করবে না তো?

—না না রাগ করব কেন? তবে একটা কথা, আমি যতদিন না বলছি, আমার কথা কিন্তু কাউকে বলবে না। যদি বল তাহলে আমাদের রাজ্যের নিয়ম অনুসারে আমি আর তোমার কাছে আসতে পারব না।

—তোমাদের দেশেও নিয়ম কানুন আছে নাকি?

—নেই আবার! প্রতি পদে পদে নিয়মের বেড়া। আর আমাদের নিয়ম কানুন আছে পালন করার জন্যে। তোমাদের মত ভাঙার জন্যে নয়।

কথায় কথায় ওরা মাঠ পেরিয়ে ডাকুদের গ্রামের প্রান্তে পৌঁছে যায়। ভুতু বলে, 'তোমাদের গ্রামে পৌঁছে গেলাম, আর তো আমি যেতে পারব না। যদি আমার কথা অমান্য না করো তো আবার পরশু দেখা হবে। বিদায় বন্ধু।' হঠাৎই ভুতু উধাও হয়ে যায়।

দু'টো দিন ডাকুর কেমন যেন ঘোরের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। একদিকে ভুতুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার স্মৃতি অন্যদিকে সেই অভিজ্ঞতার কথা কাউকে বলতে না পারার অস্বস্তি। মাস্টারমশায়ের বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকেই ডাকুর উত্তেজনা বাড়তে থাকে, 'ভুতু আসবে তো'? না এলে ওকে খুঁজে পাওয়ার কোন রাস্তা নেই। অথচ এই দু'দিনে কতো প্রশ্নই না জেগেছে তার মনে। আজ অনেক কিছু জানতে হবে ভুতুর কাছে।

সেই বাঁশ বাগানের কাছে এসে ভয়, আশঙ্কা, উত্তেজনায় ডাকুর রোম খাড়া হয়ে ওঠে। ঠিক তখনি ভুতু এসে হাজির হয়। ডাকু বলে, 'ভুতু তুমি এসেছ? আমি ভাবছিলাম হয়ত আর আসবে না।'

—কেন?

—কে জানে কেন, মনে হচ্ছিল।

—ভূতেরা মিথ্যা কথা বলে না। তোমরা নাকি প্রাণ বাঁচাতে মিথ্যে বল। আমাদের তো প্রাণ বাঁচানোর ব্যাপার নেই, তাই মিথ্যে বলার প্রয়োজন পড়ে না। অবশ্য মিথ্যে না বলেও প্রাণ বাঁচান যায় তা তোমাদের যুধিষ্ঠির ঠাকুর দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আসলে প্রাণ বাঁচাতে মিথ্যে বল, এ তোমাদের আর এক মিথ্যে কথা।

— ও সব কথা থাক। আমার অনেক প্রশ্ন আছে, তুমি উত্তর দেবে?

—জানা থাকলে কেন দেব না? বল শুনি তোমার প্রশ্ন।

—তোমাদের দেশটা কেমন?

ভুতু হা হা করে খানিক হেসে বলে, 'ঠিক তোমাদের দেশের মতই। তোমরা যেখানে আছো আমরাও সেখানেই আছি, তবে!'

—তোমরা কী যা খুশি তাই করতে পারো?

— আমরা তোমাদের কিছুই করতে পারি না। এমন কী একটা চিম্‌টিও কাটতে পারি না। চড় মারা বা গলা টিপে ধরা তো দূরের কথা।

—তোমাদের সব সময় দেখা যায় না কেন?

—হাঁ, ঐ একটা কাজ আমরা পারি, এই আছি এই নেই—

ডাকু দেখে তার বাঁ পাশ থেকে ভুতু হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। পরক্ষণে ডান পাশে ফিরে এসে বলে, 'আবার আছি।' ঠিক তখন ডাকুর গা-টা ছম্‌ছম্‌ করে ওঠে। ভুতু বলে চলে, 'এইটুকুতে তোমরা যাও ঘাবড়ে। অবশ্য ঘাবড়ে দেওয়ার আরো কৌশল আমাদের জানা আছে। যেমন কখনো এত্তটুকু—'

ডাকু দেখে ভুতু ছোট হতে হতে একটা পুতুলের মত হয়ে গেল, আবার বড় হতে হতে একেবারে তালগাছের মত লম্বা হয়ে বলল, 'কখনো এত্ত বড় হয়ে যাওয়া।' আবার আগের মত ডাকুর সমান হয়ে ভুতু বলে,

আমাদের কাণ্ড কারখানা দেখেই তো তোমাদের যত গল্প লেখা হয়। তোমরা বলো, 'রূপকথা' আর বড়রা বলে আজগুবি। এই যেমন ধরো আমি রূপকুমার পক্ষীরাজ চেপে যাচ্ছি—

ডাকু অবাক হয়ে দেখে ভুতু ধবধবে সাদা ঘোড়ায় চেপে আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

ডাকু আর ভুতুর বন্ধুত্ব খুব জমে ওঠে। সপ্তাহে তিন দিন পড়ে ফেরার পথে বাঁশ বাগানের ধারে দেখা করে আর ডাকুদের গ্রামের বটতলায় পৌঁছে বিদায় নেয়।

এদিকে ডাকুর পরীক্ষা এগিয়ে আসে। একদিন ডাকু ভুতুকে বলে, 'তুমি আমার একটা কাজ করে দেবে, আমি সারাজীবন তোমার বন্ধু হয়ে থাকব।' ভুতু সাগ্রহে প্রশ্ন করে, 'কী কাজ?'

—তুমি তো সব জায়গায় যেতে পার, একবার হেড স্যারের বাড়ি গিয়ে প্রশ্নপত্রগুলো দেখে এসে, আমায় বলে দাও না।

ভুতু গম্ভীরভাবে বলে, 'ছিঃ ডাকু তুমি আমার বন্ধু হয়ে এমন কথা বলতে পারলে? তুমি আমায় চুরি করতে বলছ! এমন কথা দ্বিতীয়বার বললে কিন্তু আমি আর আসব না।' ডাকু লজ্জা পেয়ে বলে, 'না না আমি আর কখনো এমন কথা বলব না।'

— তুমি লেখাপড়া করছ কেন? শিখবে বলে তো? আমি প্রশ্নপত্র বলে দিলে তুমি পাশ করবে ঠিকই, কিন্তু শিখতে পারবে কী? ফাঁকি দিয়ে কোন কাজ করা যায় না।

ডাকু লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকে, ভুতু ওকে উৎসাহ দিয়ে বলে, 'আমি জানি, তুমি খুব ভালো রেজাল্ট করবে, তুমি তো ভালো ছেলে।'

ডাকুর পরীক্ষা সত্যি সত্যিই খুব ভালো হল। পরীক্ষায় সব প্রশ্নই জানা পড়ল। কেন কে জানে ডাকুর মনে হল এ সবই ভুতুর কল্যাণে। ভুতুকে বলতে ও হেসে বলেছিল, 'হঠাৎ তোমার এমন মনে হল কেন? তোমার পরীক্ষা ভালো হয়েছে তোমার নিজের কৃতিত্বে, আমি বন্ধু হিসেবে খুব আনন্দ পেয়েছি, এর বেশি কিছু নয়।' বেশ কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ পথ চলে।

এক সময় ডাকু বলে, 'ভুতু তুমি আজ এতো চুপচাপ কেন? আমার পরীক্ষা ভালো হয়েছে শুনে তোমার কী আনন্দ হয় নি?'

— আমি তো বললাম, আমার খুব আনন্দ হয়েছে। আগেই বলেছি ভূতেরা মিথ্যে কথা বলে না। আমার মন খারাপ অন্য কারণে।

— কী কারণে, আমায় বলবে না?

— কাল থেকে আর তোমার সাথে দেখা হবে না।

— কেন? আমি তো তোমার কোন কথা অমান্য করি নি। তবে?

— না, না তোমার কোন দোষ নেই। আসলে আমার পুনর্জন্মের আদেশ হয়ে গেল কাল রাত্রে। আগামীকাল আমায় চলে যেতে হবে।

— কোথায়?

— তা তো আমি নিজেও জানি না।

— আর কোন দিনই যোগাযোগ হবে না?

— না, কারণ জন্মালে আর আগের কোন কথাই মনে থাকবে না। যেমন ভূত রাজ্যে আসার পর আগের জীবনের কোন কথা মনে থাকে না।

কথায় কথায় ওরা ডাকুদের গ্রামের বটতলায় পৌঁছে যায়। ডাকু আকুল হৃদয়ে সতৃষ্ণ নয়নে পিছন ফেরে। কিন্তু ভুতুকে আর দেখতে পায় না। শুধু আকাশে বাতাসে ভুতুর কথাগুলো ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়, 'বিদায় বন্ধু, ভালো থেকো।'

মুর্শিদাবাদ শহর থেকে দু ক্রোশ দূরে, নির্জন আমবাগানে তাঁবু পড়েছে। আজ রাতে চৈত্র শেষের গরমকে উপভোগ করতে খোলা হাওয়ায় বসবে জমকালো, রাজকীয় মজলিশ। দিন শেষের শেষ পাখি ঘরে ফেরার আগেই মীরণ ফুলবাইকে নিয়ে পৌঁছে গেল শিবিরে। একটু তাড়াতাড়িই পৌঁছে গেছে সে। কারণ তার পরিকল্পনা ছিল, সন্ধ্যায় জলপান করে ঘন্টা চারেক বিশ্রাম নিয়ে সারাদিনের ক্লান্তিটা দূর করে নেবে। শরীরটা চাঙ্গা করে নেবে। তারপর ইয়ার দোস্তরা পৌঁছলে মাঝরাতে শুরু হবে মেহ্‌ফিল। আহাঃ! এমন অভিনব জলসার কথা কেউ কখনো আগে শুনেছে? কল্পনা করতে পেরেছে? মাথার ওপর ঝাড়লণ্ঠন নয়, জ্বলবে কোটি কোটি তারা। গঙ্গার স্নিগ্ধ বাতাস এসে শীতল করে দিয়ে যাবে মেহ্‌ফিল। ভাবতেই মীরণের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

একটা রেকাব ভর্তি তাজা ফল নিয়ে আসে ফুলবাই, বলে, শাহাজাদা হাতমুখ ধুয়ে ফলাহার করুন।

ফুলবাই ফলের রেকাবটা সামনে রেখে পিছন ফিরতেই মীরণ তার হাতটা ধরে ফেলে। ফুলবাই হাসিমুখে ফিরে তাকায়, হুকুম করুন শাহাজাদা।

— ফুলবাই, তোমরা সবাই আমায় শাহজাদা শাহাজাদা কর কেন?

— কারণ আপনি সম্রাট মিরজাফরের পুত্র তাই।

— কিন্তু তোমরা কি জান না আজ এই সুবে বাংলার ভাগ্য কার অঙ্গুলি হেলনে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে? কে এই রাজ্য চালাচ্ছে?

— তাতো জানিই শাহাজাদা।

— তোমরা জান না আজ বাদে কাল কে মসনদে বসবে? তোমরা জাননা 'সম্রাট মীরণ' এই অভিভাষণ শোনার জন্য আমার প্রাণ কতটা বেচায়েন হয়ে থাকে?

— তাও জানি ছোটে নবাব।

— না না না, ছোটে নবাব নয়, আমার শিবিরে আমার নিজের লোকেরা আমায় শাহেনশা সম্রাট বলেই কুরনিশ করবে, এই আমার ফরমান।

— জো হুকুম, শাহেনশা।

ফুলবাই একটু মিষ্টি হেসে চলে গেল। মীরণ একটা আঙুরের থোকা তুলে নিয়ে একটা একটা করে ছিঁড়ে মুখে দিতে থাকে। তার বাঁ পায়ের ওপর রাখা ডান পা টা নাচতে থাকে। আজ মীরণের মনটা পালকের মত হাল্কা হয়ে আছে। দু'বছর আগে সিরাজকে হত্যা করার পর থেকে অঙ্ক কষে কষে পথের কাঁটা সরাতে সরাতে আজ সে এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে যে মসনদে বসাটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। তার আর মসনদের মাঝে কোন যদি কিন্তু, তবের মত অনিশ্চিত শব্দের ঠাঁই রাখে নি। এখন শুধু অপেক্ষা, আল্লাহ কবে পিতৃদেবকে স্মরণ করবেন। অবশ্য ইচ্ছে করলে সে পিতৃদেবকেও মসনদ থেকে নামিয়ে আনতে পারে। সে ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। যতই হোক তিনিই তো এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা তাকে জোর করে মসনদ থেকে নামালে ইতিহাসের পাতায় মীরণের নামে একটা কালো দাগ পড়বে—তা কখনোই চায় না সে। তার আর তার পিতার নামের অন্য সব কালো দাগগুলো? ওগুলো মুছে ফেলার মন্ত্র মীরণের জানা

আছে। সব পরিকল্পনা করাই আছে শুধু মসনদে বসার অপেক্ষা। ইতিহাসে লেখা থাকবে, চরিত্রহীন, লম্পট, অত্যাচারী, দেশদ্রোহী সিরাজের হাত থেকে কিভাবে নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করেও দেশকে রক্ষা করেছিল সম্রাট মিরজাফর আর তার উপযুক্ত পুত্র মীরণ।

কড়্ কড়্ কড়াৎ — প্রচণ্ড শব্দে মীরণের সুখ স্বপ্ন ছিন্ন হয়। সে সুখ-শয্যা ছেড়ে শিবিরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। দেখে, সারা আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। প্রচণ্ড ঝড় যেন আশপাশের গাছগুলোর চুলের মুঠি ধরে ধরাশায়ী করে দিতে চাইছে। মীরণ চিৎকার করে, এই কে আছিস? কেউ সাড়া দেয় না। সে আরো জোরে চিৎকার করে, এই কে আছিস?

শিবিরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে সালাম জানায় ফুলবাই, হুকুম করুন জাঁহাপনা।

— আমার সব বেহারা আরদালীরা গেল কোথায়?

— কে যে কোথায় গেল সঠিক বলতে পারিনা জনাব। তবে দুর্যোগ থেকে মাথা বাঁচাতে বোধহয় গাছতলাটলা কোথাও আশ্রয় নিয়েছে।

— আমাদের কী হবে ফুলবাই?

— আমাদের আবার কী হবে? আমরা তো শিবিরের মধ্যে রয়েছি। কালবৈশাখীর এই তান্ডব খানিকবাদেই শান্ত হয়ে যাবে। তারপর আপনার ইয়ার-দোস্তরা এসে পড়বে, আসবে আপনার প্রিয় নর্তকীরা। শুরু হবে জমজমাট মেহ্ফিল। আপনি শিবিরের দরজায় দাঁড়িয়ে মিছিমিছি ভিজছেন কেন? ভিতরে এসে আরাম করুন না!

মীরণ মন্ত্রমুগ্ধের মত বলে, আরাম! তারপর ফুলবাইকে অনুসরণ করে শিবিরের মধ্যে এসে বসে। কিন্তু মুখটা তার ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। এক অজানা আশঙ্কায় দেহটা ভেতর থেকে থির থির করে কাপতে থাকে। হঠাৎ এক দমকা বাতাসে শিবিরের একমাত্র আলোটা নিভে যায়। মীরণ পাশে বসে থাকা ফুলবায়ের হাতটা দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে। ফুলবাই অনুভব করে

মীরণের হাত দুটো ঠক ঠক করে কাঁপছে। সে সস্নেহে বলে, আপনি এতো উতলা হচ্ছেন কেন সম্রাট মীরণ?

মীরণ ফুলবায়ের হাতটা আরো জোরে আঁকড়ে ধরে প্রশ্ন করে, তুমি কিছু দেখতে পাচ্ছ না ফুলবাই?

— কই কিছু দেখতে পাচ্ছি নাতো! এই অন্ধকারে কিই বা দেখতে পাব?

মীরণ আগের মতই ফিস ফিস করে বলে, দেখতে পাচ্ছ না? কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছ না?—দেখতে পাচ্ছ না গত দুবছরে যে মানুষগুলোকে একে একে শেষ করেছি, তারা সবাই এসে হাজির হচ্ছে শিবিরে — মুখগুলো তাদের আনন্দে উজ্জ্বল। ওরা আজ প্রতিশোধ নিতে চায়। আজ আমার নিস্তার নেই।

— আপনি শান্ত হোন সম্রাট। এসব আপনার চোখের ভুল।

মীরণ উঠে দাঁড়ায় তেমনি চাপা স্বরে বলে, না না ভুল নয় আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ফুলবায়ের হাত ধরে টান দেয়, চলো আমরা পালাই।

— পালাব? এই দুর্যোগে কোথায় যাব?

মীরণ ফুলবায়ের হাত ছেড়ে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। বলে, তুমি না যেতে চাও তো থাকো এখানে, আমি চললাম —

মীরণের কথা শেষ হয় না, এক বজ্র গম্ভীর কণ্ঠ কেটে কেটে, চিবিয়ে চিবিয়ে শ্লেষাত্মক প্রশ্ন ছোঁড়ে, কোথায় যাবে মীরণ? মীরণ ভীষণ চমকে উঠে পিছু হঠতে গিয়ে ধরাশায়ী হয়। কাঁপা গলায় প্রশ্ন করে, কে? এক অট্টহাসি শিবিরের এক মাথা থেকে অন্য মাথা তরঙ্গ তোলে। প্রশ্ন ভেসে আসে, এতো তাড়াতাড়ি তো তোমার এ কণ্ঠস্বর ভুলে যাবার কথা নয়? তুমি কি সত্যিই চিনতে পারছ না? নাকি যাচাই করতে চাইছ?

মীরণের মুখের ভাষা হারিয়ে যায়। এ কণ্ঠস্বর তার ভীষণ পরিচিত। বোধহয় তার নিজের কণ্ঠস্বরের চেয়েও বেশী পরিচিত। কিন্তু—

এক ঝলক বিদ্যুতের আলোয় মীরণ দেখতে পায় শিবিরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে এক ঋজু সুঠাম যুবামূর্তি। মীরণ বিড় বিড় করে বলে, এ হতে

পারে না, এ অসম্ভব, এ আমার চোখের ভুল। পরক্ষণে আবার বিদ্যুৎ চমকায় মীরণ অবাক হয়ে দেখে শিবিরের দরজা ফাঁকা, কেউ নেই। এত উৎকণ্ঠার মধ্যেও মীরণ যেন একটু স্বস্তিবোধ করে। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যে। পরক্ষণেই আবার অট্টহাসিতে শিবির কেঁপে ওঠে। প্রশ্ন ভেসে আসে, কি মীরণ এবার চিনতে পেরেছ?

মীরণ অদৃশ্য আততায়ীর হাত থেকে বাঁচতে এক পা এক পা করে পিছোতে পিছোতে শিবিরের এক কোণে পৌঁছে যায়। সে অন্ধকার ফুঁড়ে কাউকে খুজতে থাকে। মুখে সে একটা কথাই বার বার বিড়বিড় করে বলতে থাকে, এ হতে পারে না, এ হতে পারে না।

গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর আসে, পারে মীরণ, হতে পারে! আর খানিক বাদেই তুমি বুঝে যাবে কেন হতে পারে, কি করে হতে পারে।

— আমি নিজে —

— আমি জানি মীরণ তুমি তোমার কাজে কোন খুঁত রাখনি সবই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের তত্ত্বাবধানে করেছ। অবশ্য প্রথম এবং প্রধান কাজটা করেছিলেন ফকির বাবা।

বজ্র গম্ভীর কণ্ঠের অভিব্যক্তি বদলে যায় গাঢ় উদাস দার্শনিকভাবে বলে চলে, ফকির বাবা! ধর্মের ধারক! সেই ইসলাম ধর্মের ধারক বাহক যে ধর্মের আদর্শ দয়া, ক্ষমা। ফকির বাবা কী করলেন—একটা তিনদিনের উপসী মানুষকে খাবারের লোভ দেখিয়ে নিজের ডেরায় আটকে রেখে, তোমার সৈন্যদের হাতে তুলে দিলেন। ছোট শত্রুতার বড় প্রতিশোধ নিলেন।

মীরণের গলা দিয়ে তার অজান্তেই উচ্চারিত হয়, সিরাজ!

— চিনেছ তাহলে। যেদিন তুমি বন্দীরূপে আমাকে পেলে, সেদিন তোমার মনে হয়েছিল আসমানের চাঁদ হাতে পেয়েছ। সেদিনের মত আনন্দ বোধহয় ইংরেজদের হাতে আমার পরাজয়ের দিনেও পাও নি! তাই না?

মীরণ কোন উত্তর দেয় না, দিতে পারে না। সে সচেতন আছে কী অচেতন হয়ে পড়েছে, নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। বাইরে ঘন ঘন বাজের আওয়াজ হচ্ছে। বিদ্যুতের আলোয় দেখা যায় ফুলবায়ের অচেতন দেহটা

শিবিরের মাঝামাঝি পড়ে রয়েছে। মীরণ কিন্তু এখনো পড়ে যায় নি। শিবিরের একটা খুঁটিকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

সিরাজ বলে চলে, আমার ঘাতক খুঁজতে তোমায় বড়ই বেগ পেতে হয়েছিল। রাজপ্রসাদের কোন ঘাতকই সিরাজের মুন্ডু কাটতে রাজি ছিল না। তারা চাকরি ছেড়ে, রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আর তোমার নিজের সাহস ছিল না দুনিয়ার তীক্ষ্ণতম তরবারি হাতে নিয়েও হাত পা বাঁধা এক সপ্তাহের উপোসী সিরাজের সামনে দাঁড়াবার। কিন্তু দুনিয়ায় তোমার মত চরিত্রের মানুষ তো কম নেই তাই শেষপর্যন্ত পেয়ে গেলে মহম্মদী বেগকে। যাকে আমি একদিন রাস্তা থেকে তুলে এনে রাজপ্রাসাদে ঠাঁই দিয়েছিলাম, সেই আমার মুন্ডু কাটতে রাজি হয়ে গেল। আর তুমিও, পিতা মিরজাফরের অনুমতির প্রয়োজনবোধ করলে না, তার হাতে তুলে দিলে একটা ভোঁতা তরোয়াল। হ্যাঁ ভোঁতা তরোয়াল, কারণ এক কোপেই যদি মুন্ডু কেটে যায়, যদি সিরাজের দেহটা যন্ত্রণায় ছটফট না করে, তাহলে তোমার তৃপ্তি হত না। তোমার অভিলাষ পূর্ণ হল। ভোঁতা অস্ত্রের পর পর আঘাতে ছটফট করতে করতে সিরাজ মরল। তার ক্ষতবিক্ষত দেহের টুকরোগুলোকে হাতির পায়ে বেঁধে সারা শহরে ঘোরালে। তারপর একে একে হত্যা করতে লাগলে যারা তোমার সিংহাসনের কাঁটা হতে পারে তাদের। সে তালিকা থেকে আমার মা-মাসীও বাদ গেল না। এখনো তোমার কাছে রয়েছে এক মস্ত বড় ফর্দ—অনেক নাম, যাদের তুমি একে একে শেষ করতে চাও। হায় মীরণ এত করেও তোমার সাধের সিংহাসন অধরাই থেকে যাবে।

কথাটা মীরণের বুকে যেন তীক্ষ্ণ তীরের মত বিঁধে যায়। তার ভয়ে কুচকে থাকা দেহটা, ছিলা ছেড়া ধনুকের মত সোজা হয়ে যায়। সে চিৎকার করে ওঠে, দুনিয়ার কোন শক্তি নেই যে আমার কাছ থেকে বাংলার মসনদ কেড়ে নিতে পারে। সিরাজ, তুমি এখন জীন, তুমি আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

আবার অট্টহাসিতে শিবির কেঁপে ওঠে। তুমি ঠিকই বলেছ মীরণ আমি এখন জীন-অশরীরী, আমি তোমার কোন ক্ষতি করতে পারব না। কিন্তু দু'বছর আগে যখন তোমাকে তোমার পিতাকে শায়েস্তা করার ক্ষমতা আমার হাতে ছিল, তখনও আমি তোমাদের কিছু করতে পারিনি। বার বার তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে, বার বার তোমাদের ক্ষমা করেছি, এই ভেবে, দাদুর আমলের মানুষ তোমার বাবা, নিজের ভুল বুঝতে পারবেন সংশোধিত হবেন। কিন্তু হয়েছে উল্টো। হায়!

সিরাজের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হতে হতে যেন বাতাসের গোঙানির আড়ালে হারিয়ে যায়। আবার অনেকদূর থেকে ভেসে আসে সেই কণ্ঠস্বর, তুমি ঠিকই বলেছ মীরণ আজ আমি অশরীরী তোমার কোন ক্ষতি করার সাধ্য আমার নেই। তবুও আজ তোমার নিস্তার নেই। তোমার পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে। আজ তোমাকে শাস্তি দেবেন স্বয়ং ওপরওয়ালা —

সিরাজের কথা শেষ হতে না হতেই চোখ ধাঁধাঁনো আলোয় শিবিরটা ক্ষণেকের জন্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, পরমুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে ওঠে সারা আমবাগান। তারপর সব চুপচাপ, শুধু বাজের আগুনে ঝলসে যাওয়া শিবির থেকে চুইয়ে ওঠা ধোঁয়া দুরন্ত হাওয়ায় সওয়ার হয়ে কোথায় হারিয়ে যায়, আর নিস্তব্ধ আমবাগানে থেকে থেকে হাওয়ার গোঁঙানির সাথে ভেসে বেড়ায় সিরাজের অট্টহাসি।

১

জামালপুরে ট্রেন থেকে নেমে উনিশ বছরের তরতাজা যুবক বরুণের নিজেকে অনেক বড় মনে হল। বিজ্ঞ মনে হল। তাই একেবারে অপরিচিত জায়গায় একা একা পৌঁছেও, ভয়ের থেকে বেশী রোমাঞ্চের শিহরণ লাগল।

ডানহাতে একটা কমদামী সুটকেশ, জামা প্যান্ট আর নানা টুকিটাকি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আছে ওতে। আর আছে সেই পরশপাথর, যার ছোঁয়ায় জীবনটা সোনা হয়ে যায়—সরকারী চাকরির এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। বাঁ হাতে শতরঞ্চি জড়ানো দড়ি বাঁধা, রাত্রে শোয়ার নুনতম সরঞ্জাম।

নির্দিষ্ট দপ্তরে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখিয়ে কাজে যোগ দিতে বিশেষ অসুবিধে হল না। সহকর্মীদের মধ্যে কাছে দূরে বেশ কিছু বাঙালির সন্ধান পেয়ে বরুণ কিছুটা আশ্বস্ত হল। কিন্তু থাকার জায়গা বা মেসের ব্যাপারে কেউই তাকে বিশেষ আশা দিতে পারল না। যারা মেসে থাকে

তাদের কাছে উত্তর পাওয়া গেল, না ভাই, আমাদের মেসে তো এই মুহূর্তে কোন সীট খালি নেই। মেস ম্যানেজারকে বলে রাখব, খালি হলেই তুমি পেয়ে যাবে। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে মুখে আশার আলো ছড়িয়ে আর একজনের নাম করে বলেছে, তুমি অমুক বাবুর সঙ্গে একবার কথা বলে দেখতো, ওদের মেসে বোধহয় একটা সীট খালি আছে।

সেই অমুকদাকে অনেক খুঁজে পেতে ধরা গেছে। তিনি আবার আর এক অমুকদাকে দেখিয়েছেন। সারাদিন একজনের কাছ থেকে আর একজনের কাছে ঘুরতে ঘুরতেই কেটে গেল। দিনের শেষে অফিসের সহকর্মীরা যখন যে যার নির্দিষ্ট ডেরার দিকে চলে গেল তখন বরুণের নিজেকে বড় অসহায় লাগে। মাকে মনে পড়ে - সেই হঠাৎ বদলে যাওয়া মা, লাল পেড়ে থেকে সাদা থান পরা, সদাহাস্যময়ী থেকে অসহায়া অথচ সংকল্প কঠিন মুখখানা। মনে পড়ে ভাইবোনগুলোর নিষ্পাপ মুখগুলো। যারা মাথার ওপরের ছাদ উড়ে যাবার ভয়াবহতা বোঝে না। বরুণের চোয়াল শক্ত হয়, ওরা সবাই আজ তার মুখাপেক্ষী তার এত সহজে ভেঙে পড়লে চলবে না।

এখন তো গরমের সময়, এক দুটো রাত রেল স্টেশানের বেঞ্চে শুয়েও কাটিয়ে দেওয়া যাবে। ভালো করে খুঁজলে একটা না একটা বাসা ঠিক পাওয়া যাবে।

বরুণ বাক্স বিছানা অফিসে রেখে, টুকিটাকি কিছু দরকারী জিনিস একটা ব্যাগে ভরে নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে। রেল স্টেশন পর্যন্ত যেতে হয় না, যে দোকানে সকালে জলখাবার, দুপুরে ভাত খেয়েছে সেখানে কিছু জলখাবার খাওয়ার জন্য ঢুকতে দোকানদার বরুণের চিন্তিত মুখ দেখে বলে, বাসা পাওনি বুঝি? বরুণ ঘাড় নেড়ে না বলতে আপ্যায়ণের সুরে বলে, ঘাবড়ানোর কিছু নেই দু'একদিনের মধ্যেই পেয়ে যাবে। আর যতক্ষণ না পাচ্ছ আমার দোকানের বাইরে খাটিয়া দুটোতো আছে, রাতটুকু ওতেই কাটিয়ে দিতে পারবে না? বরুণ দোকানদারের অযাচিত আপ্যায়ণে আপ্লুত

হয়ে যায়। ঘাড় নেড়ে জানায় সে খাটিয়ায় শুয়ে রাত কাটাতে পারবে। তাকে যে পারতেই হবে।

২

দুটো রাত দোকানের খাটিয়ায় কেটেছে। অলস সকালে বরুণ খাটিয়াতে বসে চিন্তা করছিল, দুটো দিন মেসে একটা জায়গা পাওয়ার জন্যে অনেক দৌড়দৌড়ি করেছে, কিন্তু কোন ফল হয়নি। এভাবে দোকানের খাটিয়ায় আর ক'দিন থাকা যাবে? কোন সমাধান সুত্র মাথায় আসে না।

একটা স্কুটার রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ঠিক বরুণের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। স্কুটার আরোহীর দৃষ্টি বরুণের দিকে। বরুণ চোস্তা পাঞ্জাবী পরা লোকটার দিকে তাকায়। চেনা চেনা মনে হয় কিন্তু ঠিক মনে করতে পারে না কোথায় দেখেছে। ভদ্রলোক স্কুটারটা স্ট্যাণ্ড করে দুপা এগিয়ে আসেন। বছর পঞ্চাশ বয়স টকটকে ফর্সা গায়ের রং, ঋজু লম্বা চেহারা। হাঁটার একটা নিজস্ব স্টাইল আছে। সেই হাঁটার স্টাইল দেখেই বরুণের মনে পড়ে যায় ভদ্রলোককে অফিসে দেখেছে অন্য চেহারায় অন্য পোষাকে-সুট প্যান্ট টাই পরা অবস্থায়। পোষাকের জন্যই এতক্ষণ চিনতে পারে নি। বরুণ থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়ায়। ভদ্রলোক মৃদু হেসে পরিস্কার বাংলায় প্রশ্ন করেন, নতুন জয়েন করেছ? বরুণ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। আবার প্রশ্ন, বাঙালি? এবারেও বরুণ সম্মতি সুচক ঘাড় নাড়ে।

— কী নাম?

— বরুণ ভট্টাচার্য।

— নাইস। আই এ্যম অলসো ভট্টাচার্য।

একটু থেমে ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করেন, বাসা বা মেস পাওনি বুঝি? বরুণ আবার ঘাড় নাড়ে, এবার না বোঝাতে। ভদ্রলোক স্কুটারের দিকে এক পা এগিয়ে বলেন, এসো। বলার মধ্যে একটা হুকুমের আভাস। বরুণের জেদী মন বিদ্রোহী হল, সে এক পাও নড়ল না। ভদ্রলোক পিছন ফিরে দেখে আবার ডাকলেন, এসো! এবার আর আদেশের সুর নয় অনুরোধের ছোঁয়া। বরুণ প্রশ্ন করল, কোথায়?

ভদ্রলোক স্কুটারটা স্ট্যাণ্ড থেকে নামিয়ে নিজে চড়ে বসেন। পিছনের সীটে চাপড় মেরে বরুণকে বসার ইঙ্গিত করেন। বরুণের ইতস্তত ভাব দেখে ভদ্রলোক বলেন, বাসা বা মেস পেয়ে গেলে না হয় চলে যেও, যতদিন না পাচ্ছ ততদিন আমার কোয়ার্টারে থাকো, মনে হয় চায়ের দোকানের খাটিয়ার চেয়ে আরামেই থাকবে।

বরুণের মাথার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলে চিন্তার স্রোত—বিদেশ বিভুঁয়ে এরকম প্রায় অপরিচিত একজনের স্কুটারে চেপে বসা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে! কিন্তু লোকটাকে দেখে তো ঠগ জোচ্চোর বলে মনে হয় না। তাছাড়া অফিসে দেখেছে নিজস্ব ঘেরা ঘরে বসে, বেশ উঁচু পোস্টে কাজ করে বলে মনে হয়। তাহলে লোকটার উদ্দেশ্য কী? নিছকই পরোপকার! বাঙালি প্রীতি! নাকি অন্য কিছু?

ভদ্রলোক যেন বরুণের মনের কথাগুলো পড়ে ফেলেন। মৃদু হেসে বলেন, আরে বাবা, ভয় নেই, আমি তোমায় কিডন্যাপ করব না। বেশী দূরে নিয়ে যাব না, এই সামনেই আমার কোয়ার্টার। একটু থেমে আবার তাড়া লাগান, কাম অন, কাম অন মাই বয়, কাম অন।

দু'রাত মশার কামড়ে আর ধুলোয় ভালো করে ঘুম হয় নি। এক্ষুণি কোন মেসে জায়গা পাবারও কোন সম্ভাবনা নেই, তাই যা থাকে কপালে বলে বরুণ স্কুটারে চেপে বসল। ভদ্রলোক স্কুটারে স্টার্ট দিতে দিতে বললেন, বেরিয়েছিলাম বাজার করতে, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তারপর বাজার যাব।

৩

বেশ বড়সড় উঁচু টালির চালওয়ালা বাংলো ধরনের কোয়ার্টার ভদ্রলোকের পদমর্যাদার পরিচয় বহন করছে। চারপাশে কাঁটাতার আর গাছ গাছালির পাঁচিল। সামনে লোহার গেটের একপাশে ইংরিজিতে লেখা নামের ফলক ঝুলছে - এস. পি. ভট্টাচার্য, ডিভিসানাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার। ভদ্রলোক স্কুটারে বসেই হাত বাড়িয়ে গেটের ছিটকিনি খুলে গেটটা ঠেলে

দিলেন স্কুটারটা নুড়ি বেছানো পথে ভেতরে ঢুকে যেতেই গেটটা আপনা থেকে ফিরে গিয়ে বন্ধ হয়ে গেল।

স্কুটারের আওয়াজ শুনে বছর পঁয়তাল্লিশের এক ভদ্রমহিলা চিক ঘেরা বারান্দার দরজা খুলে রুক্ষভাবে প্রশ্ন করলেন, ফিরে এলে যে? বাজার করোনি?

এতক্ষণ ভদ্রলোকের আড়ালে বসে থাকা বরুণকে ভদ্রমহিলা দেখতে পান নি। যেই পেছনের সীট থেকে বরুণ নেমে দাঁড়াল, বরুণকে দেখে যেন চমকে উঠলেন, ও কে?

— নতুন জয়েন করেছে কোথাও থাকার জায়গা পাচ্ছে না, তাই নিয়ে এলাম।

ভদ্রলোকের জবাব শুনে ভদ্রমহিলা, ওঃ! বলে যে দীর্ঘশ্বাসটা ফেললেন তাতে বরুণকে আর একবার ভাবতেই হল—এখানে আসা ঠিক হল কিনা। বরুণের মনের মধ্যে থেকেই উত্তর বেরিয়ে এলো-আমি তো এখানে নিজের ইচ্ছেতে আসিনি, আমায় নিয়ে আসা হয়েছে। এতে আমার তো কোন দোষ নেই। তবু যদি কোনরকম দুর্ব্যবহার পাই চলে যেতে তো সময় লাগবে না।

৪

অফিস ছুটির পর বরুণ যখন দু'হাতে বাক্স বিছানা ঝুলিয়ে বার হচ্ছিল যতজন পরিচিতের সাথে দেখা হল, সকলেই উৎসাহের সঙ্গে প্রশ্ন করল, মেস পেয়ে গেছ? কোন মেস? যখন শুনল এস. পি. ভট্টাচার্যের বাংলোয় ঠাঁই মিলেছে সবারই কেমন উচ্ছ্বাস কমে গেল, শুকনো গলায় ঢোক গিলে, অঃ! বলে পাশ কাটিয়ে গেল।

সকালে বাড়ির মালিকের উৎসাহের উত্তরে মালকিনের নিরুত্তাপ ব্যবহার, বিকেলে, বরুণের থাকার একটা ব্যবস্থা হয়েছে শুনেও পরিচিতদের অনুচ্ছ্বাস, বরুণের মনে কেমন এক সন্দেহের বীজ বুনে দিয়ে গেল। কোথায় যেন একটা কী ব্যাপার আছে যেটা সবাই তার কাছে চেপে যাচ্ছে।

বিকেলে বাড়ি ফিরে বরুণ দেখে মালকিনের রূপ বদলে গেছে। বাইরের গেট ধরে যেন তার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়েছিলেন। বরুণের পেছন পেছন গেট থেকে বারান্দা পর্যন্ত এলেন। বারান্দায় দু'টো মেয়ে খেলা করছিল ছোটটা বছর দশেকের, বড়টা বছর চোদ্দ পনেরোর। মেয়ে দুটো জিজ্ঞাসু চোখে বরুণের দিকে তাকাতে তাদের মা বলেন, এ হল বরুণদাদা। ওদিকের ঘরে থাকবে। যখন তখন দাদার ঘরে গিয়ে দাদাকে জ্বালাতন করবে না মোটে।

ছোট মেয়েটা মায়ের আঁচলের তলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে, কিন্তু মা—

তার কথা চাপা দিয়ে বড় মেয়েটা বলে, না না জ্বালাতন করব কেন? তাছাড়া জ্বালাতন করার সময়ই বা পাবো কোথায়? সারাদিনের পড়া, ইস্কুল, টিউসনের বাঁধা রুটিনের বাইরে আমাদের সময় কোথায়?

ভদ্রমহিলা বড় মেয়েকে, আচ্ছা ঠিক আছে। বলে থামিয়ে দিয়ে বরুণকে বলেন, চলো তোমার ঘরটা দেখিয়ে দিই। সামনের বৈঠকখানা ঘর থেকে বাঁ দিকে ঘুরে একটা ঘরের দরজার পর্দা সরিয়ে ধরে বলেন, এইটা তোমার ঘর। একটু থেমে আবার যোগ করেন, সারাদিন ধরে নিজের হাতে ঝাড়পোঁছ করে, গুছিয়ে রেখেছি। কেমন পছন্দ তো?

বরুণ অবাক চোখে একবার ভদ্রমহিলার দিকে তাকায়। ভদ্রমহিলা এগিয়ে গিয়ে বাইরের দিকের জানলাটা খুলে দেন, সামনে একটা মস্ত ঝিল। একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে শরীর মন জুড়িয়ে দিয়ে যায়। ভদ্রমহিলা ফিরে এসে আলোর সুইচটা টিপে দেন, সুন্দর সাজানো ঘরটা ঝলমলিয়ে ওঠে। ঘরে ঢুকতে ডান দিকে পড়ার টেবিল চেয়ার, পাশে বই-এর তাক, তাকে রয়েছে সংগ্রহে রাখার মত সুন্দর সুন্দর কিছু বাংলা বই। ওপাশে জামাকাপড় রাখার আলনা। বাঁদিকে দরজার ঠিক পাশেই সাবেকি আমলের ফোল্ডিং ড্রেসিং টেবিল। তার ওপাশে সোফা। সামনে বাইরের জানালা ঘেঁসে বেশ বড় সড় সুন্দর একটা খাট। খাটের মাঝামাঝি সিলিং পাখাটা বন বন করে ঘুরছে। বরুণ অবাক চোখে ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন বিশ্বাস

করতে পারে না তার থাকার জন্যে এই ঘর বরাদ্দ হয়েছে। ভদ্রমহিলা মিষ্টি হেসে বলেন, তুমি জামাকাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে নাও, ঐদিকে এট্যাচ বাথ আছে। আমি তোমার জন্য জলখাবার নিয়ে আসছি।

লুচি, বেগুনভাজা, তরকারি আর দু'টো বড় সাইজের রসগোল্লা জলখাবারের প্লেটে দেখে বরুণ রীতিমত ঘাবড়ে যায়। সে সকাল থেকে ভাবছে একরকম ঘটে যাচ্ছে ঠিক তার বিপরীত। ভেবেছিল থাকার জায়গা জুটেছে শুনে পরিচিত সহকর্মীরা খুশী হবে—হয়েছে উল্টো। ভেবেছিল, এস. পি. ভট্টাচার্য মশায়ের বাড়ির এককোণে অন্ধকার ঘুপচি ঘরে তার ঠাঁই মিলবে। মালকিন অবজ্ঞায় দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দিয়ে যাবে আলগোছে। তার বদলে হয়তো তাকে বাজার করতে হবে, রেশন তুলতে হবে, খাটতে হবে আরো নানা ফাই-ফরমাস। মনে মনে তৈরিও ছিল সে সবের জন্যে। এও ভেবে রেখেছিল, মাসের প্রথমে মাইনে পেয়ে সাধ্যমত কিছু টাকা দেবে ভট্টাচার্য কাকুর হাতে। ভট্টাচার্যকাকু হয়তো নিতে চাইবেন না টাকাটা, তখন বরুণ সবিনয়ে বলবে, আমিও যখন চাকরি করি বিনা পয়সায় থাকব কেন? পেয়িং-গেষ্ট হয়ে থাকব। কিন্তু এখন যা হাল চাল দেখছে, এই হালে থাকলে তার মাইনের পুরো টাকাটা দিয়ে দিলেও তো বোধহয় কম দেওয়া হবে অথচ তার টাকার পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে চারজোড়া অসহায় চোখ।

বরুণ ভেবেছিল প্রথমদিন বলে হয়তো যত্নটা বেশী বেশী হচ্ছে, কিন্তু সে ভুল ভাঙতেও সময় লাগল না। রোজ দু'বেলা মাছ না হয় মাংস, সঙ্গে দু'তিনরকম তরকারি দিয়ে ভাত খাছে। জলখাবারে নিত্য নতুন উপাদেয় পদ। আপ্যায়ণেও যেন অধিক থেকে অধিকতর স্নেহের ছোঁয়া। কাকিমার সম্বোধন দ্বিতীয় দিনেই তুমি থেকে তুই-এ নেমে এসেছে। ছোটখাট বকাঝকাও বাদ যাচ্ছে না। মেয়ে দুটো বরুণের এক মক্ষম অস্ত্রে ঘায়েল হয়ে গেছে - গল্প। বরুণ বেশ গুছিয়ে ছোটদের মুখরোচক গল্প বলতে পারে। এখন সেটা তার নিত্য কর্মপদ্ধতিতে দাঁড়িয়েছে। বিকেলে মেয়ে দু'টো চাতক নয়নে চেয়ে থাকে বরুণের ফেরার পথের দিকে। জলখাবারের টেবিল থেকে গল্প শুরু হয় শেষ হয় পড়ার টেবিলে গিয়ে। হ্যাঁ, বরুণ ওদের পড়ার টেবিল

পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। চাকরি পাওয়ার আগে টিউশানি করার দৌলতে বরুণের পড়ানোর অভ্যাস ছিলই। দু'একটা পড়া বুঝিয়ে দিতে দিতে এখন পড়ার টেবিলে বরুণের উপস্থিতি একান্ত কাম্য হয়ে পড়েছে। হ্যাঁ তিন জন প্রাইভেট টিউটর থাকা সত্ত্বেও।

৫

অফিসে বরুণের পরিচিতদের মধ্যে একটা কানাকানি, গুণ-গুণানি চলছিল সেটা বরুণ লক্ষ করেছিল। কিন্তু কেন কানাকানি, কিসের গুণ-গুণাণি তা অনেক চেষ্টা করেও আবিস্কার করতে পারে নি। প্রথম প্রথম ঔৎসুক্যটা বেশীই ছিল, কিন্তু ভট্টাচার্যকাকুর বাড়িতে কোন অসুবিধে না হওয়ায়— বলতেকি আশাতীত সুখে থাকতে পেয়ে, ওখানে থাকা নিয়ে যে পরিচিত মহলে কানাকানি চলত তাতে বরুণ কোন গুরুত্ব দিত না। দিন দশ বার বাদে একদিন অফিস ছুটির পর জনা চারেক পরিচিত ছেলে বরুণকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞেস করে, কি গো এস. পি. ভট্টাচার্যের বাড়িতে আছো কেমন?

বরুণ নির্দ্বিধায় উত্তর দেয়, ভালোই আছি।

— কোন ঘরে থাক, পুবের ঘরে?

— পুব পশ্চিম জানিনা, ঝিলের দিকের ঘরটাতে থাকি।

একজন বলে, আরে, ওটাইতো পুবের ঘর। আর একজন কৌতূহলী হয়, কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো? মানে কোন ভয় টয় —

তৃতীয় জন তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলে, আহাঃ, তুই আবার ওসব প্রসঙ্গে যাচ্ছিস কেন? তারপর বরুণকে বলে, বিদেশ বিভুঁই তো, একটু সাবধানে থেকো। আর যত তাড়াতাড়ি পার একটা মেস-টেস জোগাড় করে চলে যেও।

৬

বরুণ অসীম সাহসী না হলেও তাকে ভীতু বলা যায় না। কিন্তু আজ অফিসের ছেলেগুলোর কথা শোনার পর থেকেই তার মনের কোণে একটা ভয় দানা বাঁধে। সে বুঝতে পারে পুবের ঘরের কোন রহস্য আছে। রাত্রে ঘরের আলো নিভিয়ে শুতে যেতেই মনের কোণে দানাবাঁধা ভয়টা শাখা পল্লব

বিস্তার করতে থাকে। গা টা ছম ছম করে। অন্যদিনের মত শুতে না শুতেই ঘুম আসে না। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে থাকে। কেবলই মনে হয় এক্ষুনি ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে তার চোখের সামনে। কিন্তু কিছুই ঘটে না। মাঝে মধ্যে ঘরে অতি ক্ষীণ খুট খাট আওয়াজ হয়, বরুণ অন্ধকার ভেদ করে দৃষ্টি চালায় শব্দের উৎস সন্ধানে। কখনো টর্চের আলো ফেলে দেখে। এমনি করে মাঝরাত পেরিয়ে যায়। তন্দ্রা নামে বরুণের উৎকণ্ঠিত চোখে। হঠাৎ পুবের জানলায় ঘটাং করে একটা আওয়াজ হয়। নিস্তব্ধ রাত্রে সেই আওয়াজ শতগুণ বৃদ্ধি পেয়ে উৎকণ্ঠিত বরুণের কানে ধাক্কা মারে। বরুণ ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে, দেখে পুবের জানলায় একটা মস্ত বড় মুখ উঁকি মারছে। বরুণের সারা দেহ কাঁপতে থাকে, সে কোনরকমে বালিসের পাশ থেকে টর্চটা তুলে নিয়ে কাঁপা হাতে সুইচ টেপে। আলোয় মনের বল বাড়ে, সত্য প্রকাশিত হয়। বরুণ দেখে, জানলায় ওটা মস্ত বড় মুখ নয়, একটা বেড়াল কুণ্ডলি পাকিয়ে বসেছিল টর্চের আলো পড়তে জ্বলন্ত চোখ মেলে টর্চের দিকে দেখে মিঁয়াও, শব্দে প্রতিবাদ করে জানলার গরাদ গলে ওপাশে লাফ মারল।

৬

সে রাতটা প্রায় জেগেই কেটে যায়। পরদিন বরুণ ঠিক করে, যেমন করেই হোক ঐ পুবের ঘরের রহস্য তাকে জানতেই হবে। এরকম অজানা আশঙ্কায় জেগে জেগে কটা রাত কাটান যায়? কিন্তু অফিসে যাকেই জিজ্ঞেস করে, সেই কেমন যেন এড়িয়ে যায় প্রসঙ্গটা। টিফিনের সময় বরুণ টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। টিফিনের পর পাশের টেবিলের মাঝবয়সী ভালোমানুষ ঘোষবাবু বরুণকে ঠেলা দিয়ে বলেন, কি বরুণবাবু কাল রাতে ঘুমোননি নাকি?

বরুণ জেগে উঠে খানিক ফ্যাল ফ্যাল করে ঘোষবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর হঠাৎই প্রশ্ন করে, আচ্ছা ঘোষকাকু, আপনি জানেন, ঐ পুবের ঘরের রহস্যটা কী?

— কোন পুবের ঘর?

— ভট্টাচার্যকাকুর কোয়ার্টারের পুবের ঘর।

— কেন তুমি কোন ভয়টয় পেয়েছ নাকি?

— না, তা পাই নি, তবু জানতে ইচ্ছে করছে।

— রহস্য আবার কী! ঐ ঘরে ভট্টাচার্যবাবুর ছেলে থাকত। প্রায় তোমারই বয়সী ছিল। দেখতেও অনেকটা তোমার মত। ফর্সা লম্বা।

— এখন সে কোথায়?

— মারা গেছে।

— কী করে?

— অপঘাতে।

— মানে?

— ঐ পুবের ঘরের সিলিং ফ্যান থেকে গলায় দড়ি দিয়ে মারা যায়। তারপর তো ছেলেটার মা প্রায় পাগোল হয়ে গিয়েছিল। এখন শুনেছি কিছুটা ভালো আছে।

— কিন্তু ছেলেটা গলায় দড়ি দিল কেন?

— খুবই সামান্য কারণে। কাউকে কিছু না জানিয়ে ভাগলপুর চলে গিয়েছিল ফুটবল খেলতে। ছেলেটা ছিল খেলা পাগোল। খেলতও বেশ ভালো। ফিরে আসতে মা-বাবা বকাবকি করেছিল না বলে যাওয়ার জন্যে। তাই —

৭

বরুণ ভেবেছিল রহস্যের সমাধান হলে নিশ্চিন্ত হবে, কিন্তু হল তার উল্টো। সে রাতে শোয়ার পর ভয় যেন তাকে আষ্টে পিষ্টে বেঁধে ফেলল। কেবলই মনে হতে লাগল তার বয়সী একটা ছেলে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে যেদিকে ফিরছে ছেলেটা উল্টোদিকে চলে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করার পর, আগের রাত্রের অনিদ্রা-ক্লান্তির জেরে বরুণ ঘুমিয়ে পড়েছিল একসময়। হঠাৎ চমকে উঠলো গোঙানির শব্দে। চোখ খুলেই দেখে, ঠিক তার মশারির চালের কাছে, সিলিং ফ্যানের সোজা ঝুলে রয়েছে দু'টো ফ্যাকাসে পা। একবার পা দুটো নেমে আসছে মশারির চালের

কাছাকাছি, পরক্ষণে ওপরে উঠতে উঠতে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এসেছিল বরুণের গলা দিয়ে, আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরতে দেখল তার বিছানার পাশে ভট্টাচার্যকাকু, কাকিমা, দুই বোন উৎকণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

দিনের আলো ফুটতেই বরুণ তার জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করে। কোন মেসে জায়গা পেলে ভালো, না পেলে আবার দোকানের খাটিয়ায় ফিরে যাবে তবু এখানে আর এক মুহূর্ত নয়।

কাকাবাবু ঘরে ঢুকলেন। বরুণের মাথায় হাত রেখে বললেন, বিশ্বাস করো তোমার কোন অমঙ্গল হোক এ আমি চাইনি। ভেবেছিলাম তুমিও থাকার জায়গা পাচ্ছ না, একটা ঠাঁই পাবে আর ডাক্তারের পরামর্শ মত, তোমার বয়সী একটা ছেলে ঘরে ঘোরাফেরা করলে তোমার কাকিমার মাথাটা সারবে—সবই ঠিকঠাক ছিল—কিন্তু—

কাকিমা ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন, তুই এখানে থাকবি কেন? যে থাকার সেই থাকল না...।

বড় বোনটা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে কান্না ধরা গলায় বলে, বরুণদা, যেখানেই থাকো অফিস-ফেরৎ অন্তত আধঘন্টার জন্যে হলেও দেখা করে যেও।

বরুণ কারো কথার কোন উত্তর দেয় না। এই দশ বারো দিনের বন্ধন কাটিয়ে যেতে আরও কম কষ্ট হচ্ছে না। সুটকেস আর বেডিং দুহাতে ঝুলিয়ে এক পা এগোতেই তার বুকের মধ্যে টনটন করে ওঠে। সে বাক্স বেডিং নামিয়ে রেখে, রারান্দার চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়ে।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সৌমেন মুখার্জী ব্যস্ত মানুষ। তার কাছে কোন মানসিক রোগীকে দেখাতে গেলে মাস দুই তিন আগে নাম লেখাতে হয়। অবশ্য সে জন্য পিকলুর বাবা মিস্টার লাহিড়ীকে কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি। কারণ ডা. মুখার্জী ও মি. লাহিড়ীর বন্ধুত্ব যথেষ্ট পুরোনো হলেও হৃদ্যতায় এখনো ভাটা পড়েনি। ডা. মুখার্জী ফোনে যখন শুনলেন সমস্যাটা পিকলুকে নিয়ে, তখন অবাক হয়ে বললেন, যতদূর জানি পিকলু তো খুবই ভালো ছেলে। যেমন লেখাপড়ায়, তেমনি খেলাধুলায় ওর তো জুড়ি মেলা ভার। স্মার্ট, সৎ, সাহসী, পরোপকারী—এমন সুন্দর ছেলেকে নিয়ে হঠাৎ সমস্যাটা কী হল?

— সে এক ভারি অদ্ভুত ব্যাপার।

— না না, ফোনে হবে না। তুই এক কাজ কর, পিকলুকে নিয়ে আমার বাড়ি চলে আয়। দুপুরের খাওয়াটা একসাথে করা যাবে, তারপর পিকলুর কেসটা শোনা যাবে।—

দুপুরটা তো আমি ফ্রি থাকি, কাজেই নো প্রবলেম।

—ঠিক আছে? চলে আয় তাহলে।

—ও, কে! সি ইউ।

দুপুরে খাওয়ার পরে পিকলু পাশের ঘরে গেল রেস্ট নিতে। ডা. মুখার্জী মাঝের দরজাটা বন্ধ করে খাটের ওপর কোলে বালিশ নিয়ে জুত করে বসে প্রশ্ন করলেন, বল, হঠাৎ কী প্রবলেম হল? মি. লাহিড়ী শুরু করেন—

গত ডিসেম্বর মাসের শেষে, মানে দিন দশেক আগে পিকলুদের স্কুল থেকে ওদের পিকনিক করতে নিয়ে গিয়েছিল বকখালিতে। এরকম ওদের প্রতি বছরেই নিয়ে যায়। কিন্তু এবার পিকনিক থেকে ফেরার পর ছেলেটা যেন পুরোপুরি বদলে গেল। অত উচ্ছল, প্রাণবন্ত, হাসিখুশি ছেলেটা যেন বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠলো। কারো সাথে ভালো করে কথা বলে না, হাসে না, খেলা করে না। এমনকি পড়াশোনাতেও মন নেই। সব সময় কেমন যেন ভয়ে ভয়ে থাকে। কেউ হঠাৎ ঘরে ঢুকলে বা কোন শব্দ হলে চমকে ওঠে।

দিন তিনেক আগে ওদের ক্লাসের একটা ছেলে, ডাক নাম রণ্টু, ভালো নামটা মনে পড়ছে না, পাশের পাড়ায় থাকত, পিকলুর সাথে ভালোই বন্ধুত্ব ছিল—হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল। সাইকেলে যাচ্ছিল, পেছন থেকে মিনিবাস ধাক্কা মারে—স্পট ডেথ। তারপর থেকে পিকলুর ভাবান্তর যেন আরো বেড়ে গেল। অথচ ছেলেটার মৃত্যুসংবাদ শুনে চমকেও উঠলো না, কান্নাকাটিও করল না। পাথরের মত স্থির হয়ে গেল। মিনিটখানেক বাদে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করে বলেছিল, 'আমি জানতাম। আমি জানতাম এমনই কিছু হবে।'

মি. লাহিড়ী কথার খেই হারিয়ে চুপ করে যান। ডা. মুখার্জী প্রশ্ন করেন, তোরা কখনো প্রশ্ন করিস নি 'তোমার কী হয়েছে?'

—করেছি। একবার নয়, বহুবার করেছি। কিন্তু কোন উত্তর পাই নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কোন উত্তর দেয় না। বার বার প্রশ্ন করলে বিরক্ত হয়ে বলে, 'বলে কী হবে, তোমরা বিশ্বাসই করবে না।' কখনো একটু থেমে

নিজের মনে বলেছে, 'আমি নিজেই এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না।' আমরা বার বার আশ্বাস দিয়েছি, 'আমরা কি তোমায় কখনো অবিশ্বাস করেছি? তুমি বল, আমরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব।' খানিক চুপ করে থেকে শুধু মাথা নেড়েছে, কিছুই বলে নি।

ডা. মুখার্জী চিন্তিত ভাবে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলেন, 'বলাতে হবে, বলাতেই হবে। উৎস না জানলে চিকিৎসা করা যাবে না। কোন কারণে মনে বড় রকমের শক্ পেয়েছে। অথচ সাধারণ বুদ্ধিতে সেটা একেবারেই অবিশ্বাস্য ঘটনা। তাই ও ঘটনাটা বলতে দ্বিধা করছে, পাছে লোকে ওকে নিয়ে হাসাহাসি করে, উপহাস করে। আবার নিজের মনে ঘটনাটার কোনও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাও পাচ্ছে না, তাই মানসিকভাবে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এভাবে বেশিদিন থাকলে পাগলও হয়ে যেতে পারে। তাই একটুও দেরি করা যাবে না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর কাছ থেকে ঘটনাটা জানতে হবে।'

— কিন্তু কী করে?

— কথায় কথায় ওর মনের কাছে পৌঁছতে হবে। ওর মধ্যে যাতে আস্থা জন্মায়, আমরা ওকে অবিশ্বাস করব না।

ডা. মুখার্জী ও মি. লাহিড়ী চিন্তিত মুখে বসে থাকেন, সময় পেরিয়ে যায়। এক সময় ডা. মুখার্জী উঠে দাঁড়ান। বলেন, 'তুই এ ঘরেই থাক, আমি একটু পিকলুর সাথে কথা বলে আসি।'

পাশের ঘরে ঢুকেই ডা. মুখার্জীর গাম্ভীর্য কোথায় উধাও হয়ে যায়। পিকলু ওপাশের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। ডা. মুখার্জী ঘরে ঢুকেই হৈ হৈ করে ওঠেন, 'আরে পিকলুবাবু তুমি ঘুমোওনি?'

— আমি দুপুরে ঘুমোই না।

— ভেরি গুড! দুপুরে ঘুমোনো একটা বদভ্যাস, ওটা না থাকাই ভালো। তা তোমার এখন কোন ক্লাস চলছে?

— ক্লাস এইট।

— এ-ই-ট। বাঃ ভেরি গুড। তা পড়াশোনা কেমন চলছে?

এবার পিকলুর তরফ থেকে জবাব আসতে দেরি হয়। প্রায় মিনিট খানেক পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝেতে কাল্পনিক নক্সা এঁকে, মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে হতাশ গলায় বলে, 'ভালো নয়।'

ডা. মুখার্জী অবাক হয়ে বলেন, 'ভালো নয় কেন? আমি তো জানি তুমি যথেষ্ট ভালো ছেলে। প্রতি বছর এইট্টি পার্সেন্ট মার্কস পাও। তবে?' পিকলু আবার হতাশ গলায় উত্তর দেয়, 'পড়ায় মন বসছে না।'

— মন বসছে না বললে হবে? মন বসাতে হবে। মাঝে আর একটা বছর, ক্লাস নাইনটা, তারপরেই তো মাধ্যমিক পরীক্ষার ঘণ্টা বাজতে শুরু করবে।

পিকলু চুপচাপ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। ডা. মুখার্জী প্রসঙ্গ পাল্টে বলেন, 'আচ্ছা ওসব পড়াশোনার কথা থাক। সব সময়ে পড়াশোনার কথা চিন্তা করা ঠিক নয়। তার চেয়ে বল, বকখালি তোমার কেমন লাগল?' পিকলু একবার ডা. মুখার্জীর মুখের দিকে তাকায়, যেন প্রশ্নের পিছনের উদ্দেশ্য বুঝতে চেষ্টা করে। পরক্ষণেই আবার মাথা হেঁট করে ক্ষীণ স্বরে বলে, 'ভালো।' ডাঃ মুখার্জী তেমনি উৎসাহের সঙ্গেই প্রশ্ন করেন, 'ওখানে গিয়ে তো তোমার একেবারে নতুন ধরনের একটা অভিজ্ঞতা হল, তাই না?'

পিকলু অবাক চোখে ডা. মুখার্জীর মুখের দিকে তাকায়, সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে এক রহস্যময় হাসি। পিকলু কাতরভাবে প্রশ্ন করে, 'আপনাকে কে বলল?' ডা. মুখার্জী হেঁয়ালি করে উত্তর দেন, 'কেউ বলেনি। তুমি কি কাউকে বলেছ যে সে আমায় বলবে। আসলে যাকে বলবে কেউই তো তোমার কথা বিশ্বাস করবে না।' পিকলুর অবাক দৃষ্টির সামনে হাসি হাসি মুখে ডা. মুখার্জী বলে চলেন, 'আমি কিন্তু বিশ্বাস করি। এমন অনেক ঘটনাই তো ঘটে যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যায় না। আবার আজ যা অবিশ্বাস্য মনে হয় পরবর্তীকালে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। আজ থেকে দু'শ বছর আগে মানুষ কি কল্পনা করতে পেরেছিল একদিন মানুষ আকাশে উড়বে? আকাশের সীমা পেরিয়ে মহাকাশে পৌঁছে যাবে? চাঁদের বুকে হেঁটে বেড়াবে? কিন্তু আজ তা বাস্তব। তেমনি তোমার অভিজ্ঞতা আজ অসম্ভব অবিশ্বাস্য অলীক মনে হলেও দুদিন বাদে যে সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে না কে বলতে পারে?'

'তাহলে আমি যা দেখেছি ঠিক দেখেছি বলছেন?' এখন পিকলুর গলা অনেকটাই স্বাভাবিক। সেই উদাস ভাব আর নেই, বদলে উত্তেজনার ছোঁয়া লেগেছে। ডা. মুখার্জী তেমনি হাসি মুখে বলেন, 'কী করে বলব? তুমি তো এখনো আমায় বলই নি কী দেখেছ।' পিকলু মনের মধ্যে আবার একটা দোটানা অনুভব করে। তার ইতস্তত ভাব দেখে ডা. মুখার্জী মোলায়েম সুরে তাগাদা দেন, 'বলো সেদিন বকখালিতে কী দেখেছিলে?'

পিকলু জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করে—'সেদিন আমি আর রন্টু বাঁদিকের ঝাউবনে হাঁটতে হাঁটতে বেশ একটু দূরেই চলে গিয়েছিলাম। ওদিকটায় কোন লোকজন ছিল না, একেবারে শুনশান। ঝাউবনের মাঝে একটা খুব সুন্দর জায়গায় পৌঁছে আমি রন্টুকে বলি—তুই এইখানটায় দাঁড়া, আমি তোর একটা ফটো তুলি। রন্টু সানন্দে আমার নির্দেশিত জায়গায় দাঁড়াল। আমি ক্যামেরার লেন্সে চোখ রেখে দেখতে গিয়ে চমকে উঠি!' দশদিন বাদে বলতে গিয়েও যেন নতুন করে চমকে ওঠে পিকলু। দৃষ্টি এড়ায় না ডা. মুখার্জীর। চুপ করে যাওয়া পিকলুর মুখ খোলাতে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, 'কী দেখে চমকে উঠলে?'

— দেখি রন্টুর দুপাশে দুটি ভীষণ-দর্শন মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি চোখ থেকে ক্যামেরা সরিয়ে রন্টুর দিকে তাকাই—কোথাও কেউ নেই। আবার ক্যামেরার লেন্সের মধ্যে দিয়ে তাকাতেই দেখতে পাই মূর্তি দুটোকে।

ডা. মুখার্জী ফিসফিস করে প্রশ্ন করেন, 'লোক দুটোকে দেখতে কেমন?'

—বীভৎস! কুৎসিত!!

পিকলুর সারা দেহ শিউরে ওঠে। মিনিট খানেক চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে ফিস ফিস করে যেন আপন মনে বলে, 'একবার ধোঁয়ার মত আবছা হয়ে যাচ্ছে, পরক্ষণেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিশাল লম্বা, কুচকুচে কালো গায়ের রং, পরণে টকটকে লাল কাপড়, মাথায় বাঁধা ফেট্টিটাও লাল, চোখ দুটো আগুনের মত জ্বলছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে থেকে খাড়া হয়ে আছে একটা শিং, মুখে এক জোড়া করে বাঁকা গজদাঁত!'

— দেখে তুমি কী করলে?

—আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম, কিংকর্তব্যবিমূঢ়—

—তারপর?

—ওরা রণ্টুর দিকে ইঙ্গিত করে বলাবলি করছিল—একে নিয়ে যেতে হবে। শুনে আমার সারা দেহ কেঁপে উঠলো। আঙুলটা রাখা ছিল ক্যামেরার সার্টারে—চাপ পড়ে ফ্ল্যাশ হল, তাতে মূর্তি দুটো জলে কালি গোলার মত এঁকে বেঁকে ভেঙে গুঁড়িয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল। আমি রণ্টুকে বললাম, 'পালিয়ে আয়।' নিজেও ছুটতে শুরু করলাম। রণ্টু আমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। আমার কাছে প্রশ্ন করেছিল—'অমন দৌড় লাগালি কেন?' আমি কোন কথা বলতে পারিনি। ও ভেবেছিল ওর সাথে জোক করার জন্যই অমন দৌড় দিয়েছি, তাই আর দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করেনি। সবার মাঝে পৌঁছে আমি মনে মনে ভেবেছিলাম রণ্টুর বিপদ বোধহয় কেটে গেছে। সেদিন বাড়ি ফেরা পর্যন্ত খুব টেনশনে ছিলাম। রণ্টুকে চোখের আড়াল করিনি। বাড়ি ফেরার পর, যখন এক সপ্তাহ কেটে গেল তখন ভাবলাম সব-ই আমার চোখের ভুল, কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার। ভাগ্যিস কাউকে কিছু বলিনি। ঠিক তার পরই—

পিকলু কান্নায় ভেঙে পড়ে। ডা. মুখার্জী ওকে সান্ত্বনা দেন না, চুপ করতেও বলেন না। রণ্টুর মৃত্যুর পর যে কান্নাটা ওর কাঁদার দরকার ছিল, আজ সেই কান্নাটা কেঁদে হালকা হতে দেন। প্রায় মিনিট দশেক ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদার পর নিজেকে সামলে নেয় পিকলু। পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ মুখ মোছে। ডা. মুখার্জী সস্নেহে ওর পিঠে হাত রাখেন, প্রশ্ন করেন, 'তোমার ফিল্মটা ডেভলপ করিয়েছ?' পিকলু ঘাড় নেড়ে জানায়, করা হয়েছে। ডা. মুখার্জী সাগ্রহে প্রশ্ন করেন, 'সেই ছবিটা উঠেছে কি?'

—না! কেঁপে গেছে বলে ডেভলপ করেনি।

—ফিল্মটা আমাকে দেবে? আমার একটা চেনাশোনা দোকান আছে সেখান থেকে ডেভলপ করাব। দেখি না কী পাওয়া যায়।

ডা. মুখার্জীর কাছ থেকে ফিরে আসার পর এক সপ্তাহ কেটে গেছে। ডাক্তারবাবুর পরামর্শে কেউ ওকে ওই ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করেনি। পিকলু এখন প্রায় স্বাভাবিক। রণ্টুর মৃত্যুশোকও সামলে নিয়েছে। ঘটনাটা ভুলতে

চায় বলেই বোধহয় সেই ফিল্ম বা ফটোর ব্যাপারেও কোনও উৎসাহ দেখায় নি।

পিকলুর বর্ণিত ঘটনা শাখাপল্লব বিস্তার করে রঙের পর রং চড়ে গ্রামের পর গ্রাম ছড়িয়ে পড়েছে। বেশির ভাগ লোকই বিশ্বাস করে নি। তাদের যুক্তি পিকলু যদি রণ্টু মারা যাওয়ার আগে ঘটনাটা বলত তবে না হয় বিশ্বাস করা যেত।

এদিকে ডা. মুখার্জীর কাছে ফটোটা প্রিন্ট হয়ে এসেছে। ছবিটা ভীষণভাবেই কেঁপে গেছে। তবু রণ্টুর ছবিটা কোনও স্কুল ইউনিফর্ম পরা ছেলের ছবি বলে বোঝা যাচ্ছে। আশপাশের ঝাউগাছগুলো মিলেমিশে একটা সবুজ পশ্চাদপটের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ঠিক রণ্টুর দুপাশে লাল কালো মেশানো অবয়ব দুটো কী? তবে কি ও দুটো পিকলু বর্ণিত সেই যমদূত? তা কী করে সম্ভব? তাঁর কানে তাঁরই বলা কথা প্রতিধ্বনিত হয়—আজ যা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে কাল তাও সম্ভব হতে পারে। অনুভব করেন মনের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। নিজেই নিজেকে বলেন—উত্তেজনা ভালো নয়, মনকে শান্ত রাখতে হবে। কিন্তু মন শান্ত হয় না। চক্রবৃদ্ধি হারে কল্পনা; চিন্তা আর উত্তেজনা বাড়তেই থাকে। চিন্তাটা কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেন না। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে একটুও সময় নষ্ট না করে ফোন করেন তাঁর প্রিয় ছাত্র সৌমিত্রকে। সৌমিত্র অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করে, বলুন স্যার?

—একবার আসতে পারবে?

—কেন স্যার? কোনও প্রবলেম?

—হ্যাঁ, একটু অসুবিধা হচ্ছে। তোমার পরামর্শ চাই।

—নিশ্চয়ই স্যার, কিন্তু রোগীটা কোথায়?

—আমি নিজে।

—আমি এখুনি আসছি স্যার।

চিন্টু আর পিন্টু, নাম শুনে অনেকেই ভাবে বোধহয় দুই ভাই। আসলে কিন্তু তা নয়। পাশাপাশি বাড়িতে থাকে, সমবয়সী দুটো ছেলে, দুই বন্ধু চিন্টু আর পিন্টু। পিন্টু জন্মানোর আগেই তার নামকরণ হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা হল, মাস তিনেকের বড় চিন্টু যখন জন্মালো, আর তার ডাক নাম যেই চিন্টু হল, তখন সবাই পিন্টুর মাকে বলল, তোমার কোলে চিন্টুর বন্ধু পিন্টু আসবে। ব্যাস, সেই থেকে, পিন্টু জন্মানোর আগেই পিন্টুর নামকরণ হয়ে গেল। সবাই যে বলেছিল, চিন্টুর বন্ধু হবে পিন্টু পরে সে কথাটাও ফলে গেল অক্ষরে অক্ষরে।

চিন্টু আর পিন্টু যেন যেন একে অন্যের কার্বন কপি, কী চেহারায় কী স্বভাবে। দুজনেই রোগা-পটকা, গায়ের রং চাপা, হাতে পায়ে দুরন্ত, ভয় ডরের বালাই নেই।

বৈশাখ মাসটা চিন্টু পিন্টুর বড় আনন্দের সময়। গাছে গাছে আমগুলো বড় হতে হতে পাকতে শুরু করে, আর ওদের আমতলায় যাতায়াত বাড়তে

থাকে। ঝড় ঝাপটা হলে তো কথাই নেই, না হলেও ওদের বেশীরভাগ সময়টা আমতলায় আমতলায় ঘুরেই কেটে যায়। আম পেলে ভালো না পেলে গাছের আমগুলোর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছড়া কাটে -

ঝড় মামা ঝড় হ' একটা দুটো আম পড়।

আম না পেলেও ওরা কক্ষনো আম পাড়ার চেষ্টা করে না বরং কেউ পাড়তে গেলে তাকে নিষেধ করে বাধা দেয়। সে কথা বাগানের মালিকরা জানে বলেই সব বাগানে ওদের অবাধ গতি। কোন মানা নেই। ওরা বাগানে আম কুড়তে যাওয়া মানে বাগানে চৌকিদারি হয়ে যায়।

বৈশাখ মাসের শেষ দিকে রাত্তির বেলা আম কুড়িয়ে যা মজা না, বলে বোঝান যাবে না! চৌধুরী-বাগান, দৈয়ের-বাগান, বাঁড়ুজ্যে-বাগানে তো সন্ধ্যের পরে কোন লোক যায় না তাই একটু রাত করে গেলে একেবারে বিছিয়ে আম পড়ে থাকে। চিন্টু পিন্টু রোজ দশটা সাড়ে দশটার সময় পড়াশোনা শেষ করে শুতে যাবার আগে ঐ বাগানগুলোয় আম কুড়তে যায়।

সেদিনও একহাতে থলে অন্যহাতে টর্চ নিয়ে রেডি হয়ে বেরিয়েছিল দু'জনে। সেদিন বোধহয় একটু বেশীই রাত হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য তাতে ওদের কিছু যায় আসে না। আম কুড়োনোর আবার সময় অসময় আছে নাকি? চৌধুরী বাগানে ঢুকতে না ঢুকতেই আওয়াজ পায় ডান দিকের গাছ থেকে পাতায় সড় সড় আওয়াজ তুলে টিপ করে একটা আম পড়ার। দুজনের চোখ চক্ চক্ করে ওঠে। টর্চ জ্বেলে শব্দ লক্ষ করে ছোটে। কিন্তু অনেক খোঁজা খুঁজি করেও কোন আম পায় না। এবার বাগানের মাঝখানের বড় বড় আম গাছটায় আওয়াজ হয়, সড্ সড্ ধুপ। সেখানে ছোটে দুজনে। এবারেও খোঁজা-খুঁজিই সার হয়, আম পায় না। এইভাবে এ গাছতলা থেকে ও গাছতলা। ছোটাছুটি করে ওরা হাঁপিয়ে যায় কিন্তু একটাও আম পায় না। অন্যদিন আম পড়ার এত আওয়াজ পায় না, কিন্তু আম পায়। আজ খালি আম পড়ার আওয়াজ পাচ্ছে, আম পাচ্ছে না। ব্যাপার স্যাপার দেখে ওরা যখন ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে গেছে তখন শুনতে পায় তাদের বয়সী একটা ছেলের

হাসির শব্দ। খিল খিল করে হাসছে। যেন ওদের হাল দেখে খুব মজা পেয়েছে।

চিন্টু আর পিন্টু পরামর্শ করে, এ নির্ঘাৎ বটতলার গুলে। ব্যাটা সব আম কুড়িয়ে নিয়ে, এখন গাছের আড়ালে বসে বসে ঢিল ছুঁড়ে আমাদের ঠকাচ্ছে। দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা, খুঁজে তোকে বার করবই। চিন্টু পিন্টু দৌড়োয় হাসির শব্দ অনুসরণ করে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে শুনতে পায় হাসির শব্দ আসছে বাগানের অন্য প্রান্ত থেকে। ওরা সেখানে গিয়ে পৌঁছতে না পৌঁছতে শুনতে পায় হাসির আওয়াজ আসছে বাগানের আর এক প্রান্ত থেকে! এ যেন রাতদুপুরে লুকোচুরি খেলা শুরু হয়।

হঠাৎ চিন্টুকে কে যেন পেছন থেকে ঠেলা মারে। চিন্টু মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে যেতে কোনরকমে টাল সামলে নেয়। পিন্টুর দিকে ফিরে প্রশ্ন করে, তুই আমায় ঠেলা মারলি? পিন্টু আকাশ থেকে পড়ে আমি তোকে ঠেলা মারব কেন?

— তবে কে ঠেলা মারল পেছন থেকে?

দু'জনে চারদিকে দেখে কিন্তু কোথথাও কেউ নেই। পরক্ষণে আবার কে যেন পিন্টুকে ধাক্কা মারল। আর সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল হাসির আওয়াজটা পাওয়া গেল খুব কাছ থেকে। ওরা টর্চ জ্বালতে গেল, টর্চ জ্বলল না, কিন্তু ঐ কুপকুপে অন্ধকারেও ওরা পরিস্কার দেখতে পেল, ওদের পাশে ওদের বয়সী একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। চিন্টু পিন্টুকে যেমন আশপাশের চার পাঁচটা গ্রামের মানুষ চেনে ওদের দুরন্তপনার জন্যে। ওরাও তেমনি চারপাঁচটা গ্রামের মানুষকে বেশ ভালোই চেনে। বিশেষ করে ওদের বয়সী ছেলেদের তো খুব চেনে। কিন্তু এ ছেলেটা একদম অচেনা। চিন্টু প্রশ্ন করে, এই তোর নাম কিরে?

— তোদের নাম আগে বল, তারপর আমি বলব।

— আমি চিন্টু আর এ পিন্টু। এবার তোর নাম বল।

— আমি রিন্টু।

এবার পিন্টু উত্তর দেয়, ইয়ার্কি হচ্ছে? আমাদের সাথে মিলিয়ে বানিয়ে বানিয়ে নাম বলা হচ্ছে? দেব এক থাপ্পড়!

— তোরা দু'জন আছিস বলে ভেবেছিস আমায় থাপ্পড় মেরে পার পেয়ে যাবি? আমি ক্যাঁটকা-কল জানি। এমন দেব না —

চিন্টু দুজনকে থামিয়ে বলে, আরে থাম থাম, মারামারি করিসনি। তারপর রিন্টুকে প্রশ্ন করে, তুই থাকিস কোথায়?

— তোরা কোথায় থাকিস?

— আমরা তো এখানেই থাকি।

— আশ্চর্য! তোরা এখানে থাকিস আমিও এখানেই থাকি অথচ তোদের কোনদিন দেখিনি তো!

— আমরাও তো সে কথাই ভাবছি।

— যাগগে, বাদ দে ওসব কথা। তোরা আড্ডায় যোগ দিতে এসেছিস তো? চল যাই, আড্ডা শুরু হবার সময় হয়ে গেল। এখন এদিক সেদিক ঘুরলে হেঁড়ে মাথা ভুঁড়ো পেট সম্পাদকটা খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করবে।

— আড্ডা? কিসের আড্ডা?

— ওমা তোরা কিছুই জানিস না? আজ কোন তিথি?

— তিথি আবার কী?

— আরে বাবা, প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা এগুলোকে বলে তিথি। আজ কোন তিথি?

— জানি না।

— আকাশে চাঁদ উঠেছে?

— না।

— উঠবেও না সারারাত। তাহলে আজ কোন তিথি?

এবার পিন্টু উত্তর দেয়, অমাবস্যা?

— ঠিক। প্রতি অমাবস্যায় আমাদের মাসিক আড্ডা বসে, তোরা জানিস না?

— কৈ না তো!

— ভালোই হল, সম্পাদককে বলা যাবে, আমি দুজন নতুন সদস্য নিয়ে এসেছি। তাহলে আমার ওপর সম্পাদকের একটু নেক নজর পড়তে পারে। চল চল আড্ডায় যাওয়া যাক।

এবার চিন্টু পিন্টু একটু ঘাবড়ে যায়। মুখ চাওয়াচায়ি করে। এতো রাত্রে কিসের আড্ডারে বাবা! চিন্টু বলে, না না এতো রাতে আমরা কোথাও যাব না।

— না না কোথাও যেতে হবে না। এই তো, এখানেই তো আড্ডা। ঐ দেখ সবাই এসে গেছে। রিন্টুর বাড়ানো হাতের ইশারাতে ওরা তাকিয়ে দেখে চৌধুরী-বাগানের ঠিক মাঝখানে বেশ ভিড়। কোন আলো জ্বলছে না অথচ প্রত্যেককে বেশ পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। রিন্টু পরিচয় করিয়ে দেয়, ঐ যে ছোটখাট চেহারার মানুষটা খুব ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে, ঐ হচ্ছে সভাপতি। এমনিতে ভালো তবে সম্পাদকের কথায় ওঠে বসে। তবে ও আছে বলেই এখনো সংগঠনটা টিকে আছে। আর ঐ মঞ্চের ওপর চোস্তা পাঞ্জাবি পরা ব্যাগ কাঁধে লোকটা দেঁতো হাসি হেসে সবাইকে আপ্যায়ন করছে ঐ হল সম্পাদক। গুণী লোক তবে ক্ষমতায় থাকলে যা হয় একটু পক্ষপাতিত্ব আছে। আর ঐ যে ধুতি পাঞ্জাবি পরে মঞ্চে বসে আছে, একগাল কাঁচা পাকা দাড়ি ও হল আজকের সভার প্রধান অতিথি। সাত প্রান্তর পেরিয়ে এসেছে। বলে ভালো সন তারিখ উল্লেখ করে যুক্তি দিয়ে বেশ ভালো বক্তৃতা করে। তবে মুশকিল একটাই — সেই গল্পটা জান তো, একজন গরু সম্বন্ধে ভালো জানে, তাকে যে বিষয়েই বলতে বলা হোক ঘুরে ফিরে সেই গরুর প্রসঙ্গেই চলে আসে। এরও সেই রোগ আছে। আর মঞ্চে যে ধুতি সার্ট পরে বসে আছে ও হল আজকের সভার সভাপতি, জাত পাত নিয়ে রিসার্চ করছে। প্রধান অতিথির সঙ্গে ওর আবার একদম বনে না। আর কথা বলা যাবে না। সভা শুরু হচ্ছে, এখন কথা বললে সম্পাদক খ্যাঁক খ্যাঁক করবে।

জনা দুয়েকের বক্তৃতা হয়ে যেতে পিন্টু চুপি চুপি রিন্টুকে প্রশ্ন করে, আচ্ছা, ব্যাপারটা কি বলত, সবাই শুধু ভূতের বাসস্থান, ভূতের ভবিষ্যৎ

ভূতের আচার ব্যবহার, ভূতের জাতপাত এইসব নিয়ে আলোচনা করছে কেন?

রিন্টু অবাক হয়ে বলে, ভূতেরা ভূতেদের সুবিধে অসুবিধে নিয়ে কথা বলবে না তো কি মানুষের অসুবিধে নিয়ে কথা বলবে?

চিন্টু কাঁপা গলায় বলে, তুই ভূত?

পিন্টু বলে, এখানে সবাই ভূত?

রিন্টু তোতলাতে থাকে, তো-তো-তোরা মানুষ নাকি? ভীষণ ভয় পেয়ে তার মুখ চোখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। পরক্ষণে সে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় শুধু তার গলা শোনা যায়, মানুষ, মানুষ, পালাও—

জমে ওঠা সভা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে, সবার মুখে পালাও পালাও রব। একমুহূর্তে জায়গাটা ভোজবাজির মত ফাঁকা হয়ে যায়। শুধু একটা বাচ্ছা ভূত দু'হাতে চোখ চাপা দিয়ে চেঁচাতে থাকে, ওরে বাবারে মানুষ আমায় ধরে ফেলল রে। অন্ধকার থেকে একটা হাত এসে বাচ্ছা ভূতটাকে অন্ধকারে তুলে নিয়ে যায়।

চিন্টু আর পিন্টু হতভম্ব হয়ে দেখে জায়গাটা একেবারে শুনশান হয়ে গেছে। ওরা দুজন ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে!

প্রতিষেধক

১

আমরা চারজন, আমি, অনির্বাণ, সৈকত আর গগন ছিলাম কলেজ হোস্টেলে রুম-মেট। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বটা, সাধারণভাবে রুম-মেট বলতে যা বোঝায় তার চেয়ে অনেক গভীর ছিল। সপ্তাহ শেষে সবাই যখন নিজের বাড়ি যাবার জন্য ছটফট করত, আমরা তখনো চারজনে একসাথেই যাত্রা করতাম। এক এক সপ্তাহে এক একজনের বাড়ি হাজির হতাম সবাই মিলে। আমাদের বাড়ির গুরুজনেরাও সেটা জানতেন এবং নীরবে প্রশ্রয়ও দিতেন।

সেদিন শনিবারের আধা কলেজ সেরে যখন চারজনে গগনের বাড়ি যাব বলে বার হচ্ছি, আকাশ রীতিমত তর্জন গর্জন করে আমাদের নিষেধ করেছিল। কিন্তু আমরা তো নিষেধ শোনার পাত্র নয়, যাব যখন মনস্থির করেছি যাবই। তাই আকাশের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করেও বেরিয়ে পড়লাম। ফল যা হবার তাই হল, নির্দিষ্ট স্টেশনে যখন নামলাম তখন

মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। ট্রেন থেকে নামতে না নামতেই কুলকুল বৃষ্টিতে বিলকুল ভিজে একেবারে পান্তাভাত হয়ে গেলাম। ভিজেই যখন গেলাম আর দাঁড়াব কেন? ঐ বৃষ্টি মাথায় করে হাঁটতে শুরু করলাম।

গ্রামের দিকে একটু ঝড়বৃষ্টি হলেই কারেন্ট চলে যায়, ফেরবার কোন নির্দিষ্ট দিনক্ষণ না জানিয়েই। কুপকুপে অন্ধকার, ঝমঝম বৃষ্টি, তার সাথে তাল মিলিয়ে ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর আর ঝিঁ ঝিঁ পোকার পরিত্রাহি চিৎকার, সে এক জমজমাট ব্যাপার।

গগনদের বাড়ি যখন পৌঁছলাম তখন আমাদের চেহারাগুলো হয়েছে দেখবার মত। হ্যারিকেনের আলোয় একে অপরের চেহারা দেখে আমরা নিজেরাই হেসে অস্থির। শেষে গগনের বাবার ধমকানি খেয়ে হাত পা ধুয়ে মুছে শুকনো জামাকাপড় পরে, সুস্থ হয়ে ঘরে ঢুকে দেখি সেখানে আর এক চমক। ঘরের মস্তোবড় খাটের এককোণে বসে মিটিমিটি হাসছে গগনের ছোটকাকা। উত্তরপ্রদেশের প্রবাস থেকে আজই বাড়ি ফিরেছে। আমরা বিনা ভূমিকায় ছোটকাকাকে ঘেরাও করি। জাঁকিয়ে বসে আবদার করি, ছোটকাকা গল্প বলো। গল্পের জাহাজ ছোটকাকা বিছানায় একটা থাপ্পড় মেরে বলে, অবশ্যই গল্প বলবো। আপনারা এতো দুর্যোগে এতোটা পথ এসেছেন আমার গল্প শোনার জন্য, আর আমি গল্প বলব না? তাই কখনো হয়, না হতে পারে, না হওয়া উচিত?

ছোটকাকা সবসময় ছোটোদের আপনি আপনি করে কথা বলেন। প্রথম প্রথম বেশ অস্বোস্তি হয় আবার দুচার মিনিটে সে অস্বোস্তি কেটেও যায়। আবার আমরা মোটেই ছোটকাকার গল্প শুনব বলে এই দুর্যোগে এখানে আসি নি, তবে সে সব কথা বলে সময় নষ্ট করার মত বোকা আমরা নই। তাই ওসব প্রসঙ্গ না তুলে বলি, তবে শুরু করো গল্প। ছোটকাকা মিটি মিটি করে আমাদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, শুরু করার আগে জানা দরকার আপনাদের খিদে কেমন। ছোটকাকার কথাবার্তার সঙ্গে আমরা ভালোই পরিচিত তাই তার প্রশ্নের মানে বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না। আমি উত্তর দিই, খিদে ভালোই আছে, যা দেবে তাই খেয়ে নেব।

অনির্বাণ প্রতিবাদ করে, না না যা দেবে তাই খাব কেন, আমাদের কি রুচি নেই? এমন পরিস্থিতিতে যা সবচেয়ে মুখোরোচক তাই খাব — ভূতের গল্প। সৈকত অনির্বাণকে সমর্থন জানায়, আহাঃ! ভূতের গল্প যা জমবে না! বাইরে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে, ব্যাঙ ডাকছে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। ঘরে হ্যারিকেনের অল্প আলোয় আলো আঁধারির খেলা — পুরো জমে যাবে একেবারে। গগন বলে, থাক তোকে আর কাব্য করতে হবে না। ছোটকাকা শুরু করো।

ছোটকাকা গুছিয়ে বসে, সকলের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বলে, আপনারা তাহলে ঐক্যমত্যে পৌঁচেছেন, ভূতের গল্পই হবে, —তবে তাই হবে। কিন্তু আপনারা সকলে আমার গল্প বলার শর্ত জানেন তো?

সবাই একসাথে উত্তর দিই জানি জানি জানি। গল্পের মাঝখানে কোন কথা বলা যাবে না — আমরা রাজি।

ছোটকাকা গুছিয়ে বসে বলেন, তাহলে শুরু —

২

আমি তখন আপনাদের মত কলেজের ছাত্র। আমার সঙ্গে পড়ত অজিত, অজিত নারায়ণ চৌধুরী। জমিদার বংশের ছেলে, সে কথা বলে না দিলেও তার চেহারা দেখলেই যে কেউ বুঝতে পারত। যেমন লম্বা চওড়া চেহারা তেমনি টকটকে গায়ের রং। যেমন বড়লোক ছিল তেমনই ছিল রুচিবান আর শৌখিন। পোষাকে সবসময় থাকত আভিজাত্যের ছাপ। কিন্তু আমরা তিনজন অর্থাৎ অজিতের হোস্টেলের রুমমেটরা জানতাম, তার গলায় সবসময় ঝোলে তার বেশভূষার সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান একটা মস্ত বড় তাবিজ। সারাদিন তাবিজটা পোষাকের আড়ালে থাকত হস্টেলের ঘরে পোষাক বদলানর সময় আমরা ক'জন সেটা কখনো কখনো দেখতে পেতাম। ঐ বেমানান তাবিজটার জন্য অনেক ব্যঙ্গ করতাম কিন্তু অজিত সেসব গায়েই মাখত না। একদিন আমাদের এক রুমমেট, অজিত যখন ঘুমচ্ছিল ওর গলা থেকে তাবিজটা খুলে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল। সেদিন প্রথমবার অজিতকে রাগতে দেখেছিলাম এবং তার প্রচণ্ড রাগ দেখে আমরা সবাই

ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আর যে ছেলেটা তাবিজ লুকিয়ে ছিল সে রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে সাথে সাথেই তাবিজটা অজিতকে ফেরত দিয়ে দিয়েছিল। তবু অজিতের রাগ কমতে দু'দিন সময় লেগেছিল।

বেশ কিছুদিন পরে একদিন অজিতকে একা পেয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, আমার মন বলছে এই তাবিজের সঙ্গে কোন গল্প লুকিয়ে আছে। অজিত তার স্বভাবসিদ্ধ হাসি দিয়ে ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল, আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা, তোর হাসিই বলে দিচ্ছে গল্প একটা আছে। আমাকে গল্পটা বলতে কোন অসুবিধে আছে? তবুও অজিত পাশ কাটাতে চায়, আমরা গ্রামের মানুষ, এমন অনেক কিছু বিশ্বাস করি যা অন্য অনেকে বিশ্বাস করে না।

— আমিও গ্রামেরই ছেলে। আমি তোর কোন কথা অবিশ্বাস করব না।

— তুই হয়তো অবিশ্বাস করবি না, কিন্তু যাকে বলবি সে অদ্ভুতভাবে তাকাবে আমার দিকে।

— বেশ, আমি কথা দিচ্ছি কলেজের কাউকে এগল্প বলব না।

এত প্রতিজ্ঞাতেও সহজে অজিতের মন গলেনি। প্রায় সপ্তাখানেক ওকে জপিয়ে অনেক প্রতিজ্ঞা করে তারপর ওর আস্থা অর্জন করতে পেরেছিলাম। যেদিন অজিত বলতে শুরু করল, সেদিন নিজের থেকেই শুরু করল গল্পটা। দিনটা ছিল ছুটির দিন আমাদের বাকি দুই রুমমেট যে যার বাড়ি গিয়েছিল। সন্ধ্যেবেলা আমরা দুজনে ঘরে বসেছিলাম। অজিত সস্নেহে তাবিজটায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, আমি জ্ঞান হয়ে থেকে এই তাবিজটা বাবার গলায় শোভা পেতে দেখেছি। কোনদিন কোন কারণেই তিনি এটা খুলতেন না। আমি যেদিন কলেজ হোস্টেলে থাকব বলে বাড়ি থেকে যাত্রা করলাম তার আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় বাবা আমাকে তাঁর ঘরে ডাকলেন। নিজের গলা থেকে তাবিজটা আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এটা সেই কলেজ জীবন থেকে আমার গলায় আছে, আজ তোমাকে দিলাম কখনো খুলবে না এটা গলা থেকে।

— এটা কিসের তাবিজ বাবা?

— এর পেছনে যে কাহিনী আছে তা হয়তো তুমি বিশ্বাস করবে না। শুধু জেনে রাখ এই তাবিজ তোমাকে সমস্ত অশুভ শক্তির থেকে রক্ষা করবে। এটা সাবধানে রাখবে, হারাবে না।

— সাবধানে নিশ্চই রাখব। কিন্তু এর পেছনে একটা কাহিনী আছে বললে, সেই কাহিনীটা শুনতে খুব ইচ্ছে করছে। তুমি তো বেশ জানো তোমার কোন কথা অবিশ্বাস করার মত ধৃষ্টতা আমার কখনো হবে না।

— বেশ তুমি যখন শুনতে চাও আমার শোনাতে কোন আপত্তি নেই। এরপর অজিতের বাবা অরূপবাবু যে গল্প অজিতকে শুনিয়েছিল, অজিত যে গল্প আমাকে শুনিয়েছিল সেই গল্পটাই আজ আপনাদের শোনাব। তবে গল্পটা অজিতের জবানীতে বা তার বাবার জবানীতে না বলে সরাসরি গল্পের আকারে বলব। আমারও বলতে সুবিধে হবে আপনাদেরও শুনতে ভালো লাগবে।

৩

অরূপ নারায়ণ রায়চৌধুরী নামটাও যেমন জমকালো মানুষটাও ততটাই। বি. এস. সি. ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র অরূপকে তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত প্রত্যেকে ভালোবাসে তার মিষ্টি স্বভাবের জন্যে। প্রত্যেকের বিপদের দিনে সবার আগে পাশে পায় অরূপকে। সে সকলের বিপদের বন্ধু, দুঃখের সমব্যথী, অসহায়ের সহায়। তাই সকলের নয়নের মনি সে।

শুধু তাই নয়, পড়াশোনায় সে সবার আগে না হলেও যথেষ্টই মেধাবী। খেলাধুলোতেও তার সমান উৎসাহ, আন্ত-মহাবিদ্যালয়, আন্ত-বিশ্ববিদ্যালয় অনেক মেডেল আছে তার ঘর আলো করে। আবার কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অরূপকে ছাড়া ভাবাই যায় না। নাটকের মুখ্য চরিত্রে তো অরূপ থাকবেই, তাছাড়াও অনুষ্ঠান পরিচালনা, বহিরাগত শিল্পীদের দেখভাল, প্রয়োজনে ঘোষক, শিল্পীর অভাবে গায়ক সব ভূমিকাতেই সে সমান পারদর্শী। শুধু যে কাজ চালিয়ে দেয় তাই নয় প্রতি ব্যাপারেই যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় রাখে।

এমন ছেলে বছর তিনেক পর বাড়ি ফিরলে যা হয়—সারাগ্রামের হাওয়ায় যেন খবর হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কথাটা। ভিড় জমে গেল অরূপের বাড়িতে। অরূপের বাবা উদয়নারায়ণবাবু রাশভারী মানুষ। গ্রামের সব লোক শ্রদ্ধা করে মানুষটাকে, তাঁর সততা এবং পরপোকারের জন্যে। উদয়বাবু উপস্থিত সবাইকে যথেষ্ট বিনীতভাবে বললেন, তোমরা অরূপকে কতটা ভালোবাস আমার অজানা নয়। আর সে জন্যেই তোমাদের বলতে ভরসা পাচ্ছি, তোমরা অন্তত ভুল বুঝবে না। অরূপ কিন্তু এখানে এসেছে ফাইনাল পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে, ঠিক দু'মাস বাদে ওর পরীক্ষা।

এরপর ভিড় পাতলা হতে বেশী সময় লাগেনি। তাকে ঘিরে জমে ওঠা ভিড় কেটে যেতে অরূপ কিছুটা স্বস্তিবোধ করে। ঘুরতে শুরু করে এঘর থেকে ওঘর। কতদিন পরে বাড়ি এলো, বিশাল বাড়িটার প্রতিটা ঘর যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। কাছে গেলে ফিসফিস করে ছোটবেলার গল্প শোনায়। অরূপ অবাক হয়ে ভাবে, প্রতিটা ঘরে কতো কতো স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। বাড়ির প্রতিটা ইঁটে যেন রয়ে গেছে তার হারান শৈশব। ঘুরতে ঘুরতে কখন যেন পৌঁছে যায় তিনতলার ছাদে। ঠাকুরদার কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে একদিন ঠাকুরদা তাকে কোলে নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে বলেছিল, জানিস দাদাভাই, চারদিকে যতো দূর দেখতে পাচ্ছিস এইসব জমি একদিন আমাদের ছিল। আমরা ছিলাম এখানকার রাজা। অরূপ প্রশ্ন করেছিল, এখন আর নেই? ঠাকুরদা ঘাড় ঝাঁকিয়ে না বলেছিল। সে না'য়ের সঙ্গে মিশেছিল এক গভীর দীর্ঘশ্বাস। ছোট্ট অরূপ জানতে চেয়েছিল, কেন নেই? ঠাকুরদা বলেছিল সে তুমি বড় হলে সব জানতে পারবে। আজ অরূপ বড় হয়েছে, জানতেও পেরেছে তাদের জমিদারী হারানোর কারণ। জেনে তার যে খুব দুঃখ হয়েছে তা নয়। কিন্তু ঠাকুরদার সেই দীর্ঘশ্বাসটা যেন এখনো তার কানের কাছে বাজে, বুকের মধ্যে টনটন করে ওঠে।

পায়ে পায়ে অন্দরমহল পেরিয়ে, মাঝখানের চৌকো উঠোন পেরিয়ে অরূপ পৌঁছে যায় বার মহলে। মাঝখানে মস্ত সিংহ দরজার দুপাশে সারি সারি ঘর। একসময়ে এখানে গমগম করত খাজাঞ্চিখানা। অরূপ দেখেনি

গল্প শুনেছে ঠাকুরদার কাছে। সারাদিন কতো লোকের সমাগম হত। একেবারে দক্ষিণ প্রান্তের ঘরটার দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় সে। তালা দেওয়া নেই, একটু জোরে ঠেলা দিতেই খুলে যায় দরজা। অনেকদিনের অব্যবহারে চারিদিকে ধুলো জমে গেছে। ঝুল পড়েছে দেয়ালে জানলায় ঘরের কোণে কোণে। অরূপের মনে পড়ে, ছোটবেলায় কোন অপরাধের শাস্তি হিসেবে বাবা এই ঘরে তাকে সারাদিন বন্ধ করে রেখেছিল। মা কান্নাকাটি করেও তার মুক্তির আদেশ জারি করাতে পারে নি। প্রথমে অরূপ খুব কেঁদেছিল, দরজায় কিল চড় ঘুসি লাথি মেরে, ঘরময় ছোটাছুটি করে, চেঁচিয়ে, সারা বিশ্বের কাছে অভিযোগ পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রশান্ত স্বভাব বাবার বুকে কোন ঢেউ তুলতে পারে নি। তিনি অচঞ্চল মনে তার দৈনন্দিন কাজ করে গিয়েছিলেন। একসময় অরূপ শান্ত হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমের জানলা খুলে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন উদাস হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন কোন সমুদ্র সবুজ হয়ে গিয়েছে। সেই কচি ধানের সবুজ সমুদ্রে ঢেউ উঠে এগিয়ে এসে আছড়ে পড়ছে জানলার পাশে লালচে খোয়া বিছনো রাস্তায়। সে এক মনরম দৃশ্য, যা দেখে দেখে আশ মেটে না। সেই দৃশ্যের চুড়ান্ত রূপ দেখেছিল যখন সেই সবুজ সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে ধোঁয়ার পাল তুলে একটা রেলগাড়ি গিয়েছিল। যেন সবুজ ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে ভেসে ভেসে চলে গিয়েছিল রেলগাড়িটা।

অরূপ নিজের অজান্তেই পৌঁছে গেছে ঘরের পশ্চিমপ্রান্তে। ছিটকিনি খুলে টান দেয় জানলার কপাটে, জানলা খুলে যেতে মনে হয় জানলার ফ্রেমে সেই দশবছর আগের ছবিটাই ঝুলছে। সেই সবুজ সমুদ্রে ঢেউ উঠছে আছড়ে পড়ছে যেন জানলার ধারের রাস্তায় এসে। আসলে এটাও তো সেই দশবছর আগের মতই নভেম্বর মাস। আজও সবুজ সমুদ্রে ভেসে ভেসে চলে গেল একটা রেলগাড়ি। তফাৎ শুধু একটাই আজ আর রেলগাড়ির মাথায় নেই ধোঁয়ার পাল।

৪

উদয় নারায়ণ রায়চৌধুরী যতই রাশভারী মানুষ হন না কেন, অরূপের কোন কথা কোন আবদার অস্বীকার করেন না। কথাটায় উদয়বাবুর যতটা ঔদার্য্য প্রকাশ পায় সেটুকুকে অস্বীকার না করেও বলা যায়, এব্যাপারে অরূপেরও একটা বড় ভূমিকা আছে। সে কখনোই এমন কোন আবদার করে না যা রাখতে উদয়বাবুকে অস্বস্তিতে পড়তে হয়, বা দুবার চিন্তা করতে হয়। তবু অরূপ যখন বলল, আমি ভাবছি বার মহলের দক্ষিণের ঘরটায় থাকব। তখন উদয়বাবু ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করেছিলেন, বার মহলে? অরূপ যুক্তি দেখিয়েছিল, অন্দরমহলের চেঁচামেচি হৈ চৈ এর থেকে বার মহল অনেক বেশী নিরিবিলি। পশ্চিমে ধানক্ষেত দক্ষিণে আমবাগান-শান্ত পরিবেশ, তাছাড়া ঘরটায় আলো হাওয়াও প্রচুর। উদয়বাবু আর দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন তোলেন নি।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে অরূপ দেখেছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বার মহলের দক্ষিণের ঘরে মেরামতি, ধোয়া মোছা, রং করার কাজ চলছে। কয়েক ঘন্টায় ঘরটার চেহারাই বদলে গিয়েছিল। অরূপ পরদিন সকালেই নতুন করে গৃহপ্রবেশ করেছিল সেই ঘরে। দু'দুটোদিন এদিক সেদিক করে খরচ হয়ে গেছে, আজ থেকেই পুরোদমে পড়াশোনা শুরু করতে হবে।

ঘরের সাবেকি ঘড়িটা যখন ঢং ঢং শব্দে মধ্যরাত্রি ঘোষণা করল তখন বইখাতা বন্ধ করে অরূপ পড়ার টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। একগ্লাস জল খেয়ে এসে দাঁড়ায় পশ্চিমের জানলায়। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা জোরাল আলোর পিছু পিছু একঝাঁক ছোট আলোর সারি ছুটে ছুটে মাঠ পেরিয়ে গেল। লাস্ট ট্রেন চলে গেল। অরূপ মুগ্ধ নেত্রে ট্রেনটার মাঠ পেরিয়ে যাওয়া দেখে। ট্রেনটা চলে গেলে শুতে যাওয়ার তোড়জোড় করে। তারপর থেকে ওটাই অরূপের রুটিন হয়ে যায় - রোজ গ্রাণ্ডফাদার ক্লকে বারোটার ঘন্টা বাজলে বইখাতা বন্ধ করে পশ্চিমের জানলায় এসে দাঁড়ায়। মাঠের উত্তরপ্রান্ত থেকে লাস্ট ট্রেনের আলো দেখা দেয় - উজ্জ্বল হেড লাইটের পেছন পেছন এগিয়ে

আসে সারবন্দী ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো। অন্ধকার মাঠ পেরিয়ে সেই আলোর মিছিল দক্ষিণ দিকে মিলিয়ে গেলে অরূপ শুতে যায়।

সেদিনও অরূপ প্রতিদিনের মত রাত বারোটার ঘন্টা পড়তেই বইখাতা গুছিয়ে রেখে পশ্চিমের জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যথাসময়ে উত্তর প্রান্তে দেখা দিল লস্ট ট্রেনের আলো। স্বাভাবিক গতীতেই এগিয়ে আসতে লাগল আলোর মিছিল। কিন্তু ছন্দপতন ঘটল মাঝমাঠে এসে, হঠাৎ আলোর মিছিলের গতি কমতে লাগল। গাড়িটা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নিত্যদিনের পরিচিত দৃশ্যপটে পরিবর্তন এলে মনটা কেমন যেন খচখচ করে। ঐ ট্রেনটার সঙ্গে অরূপের কোন যোগাযোগ নেই। গাড়িটা যদি সারারাত ঐ মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে অরূপের কিছুই যায় আসে না। তবু অরূপের মনটা অধীর হয়। প্রশ্ন যাগে মনে, কেন গাড়িটা ওখানে দাঁড়িয়ে পড়ল? ওখানে তো কোন স্টেশন নেই, সিগনাল নেই, লেভেল ক্রসিং নেই, কিছুই নেই। তবে কেন দাঁড়াল গাড়িটা। পরক্ষণে মনে প্রশ্ন জাগে, গাড়ির যাত্রীদের মনের অবস্থা কী হচ্ছে? গাড়ি যদি আর না চলে, এই মাঝরাতে তারা কী করবে, কোথায় যাবে?

অরূপের চিন্তাস্রোত আর বেশী প্রবাহিত হওয়ার আগেই, মিনিট পনেরো দাঁড়িয়ে থেকে আবার গাড়িটা চলতে শুরু করল। আস্তে আস্তে গতিবেগ বাড়িয়ে একসময় মাঠ পেরিয়ে চলে গেল। গাড়িটা চলে যাওয়ার পরেও অরূপ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। প্রশ্নটা বার বার ঘুরে ফিরে মনের মধ্যে খচ খচ করে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল কেন? উত্তর পাওয়ার কোন উপায় নেই—অন্তত আজ রাতে উত্তর পাওয়ার কোন রাস্তাতো নেইই। কাল সকালেও যে উত্তর পাওয়া যাবেই তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। হয়তো অযাচিতভাবে উত্তর মিলে যেতে পারে। কিন্তু যদি না মেলে তবে একটা গাড়ি কেন রাত বারোটার সময় মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ল তার খোঁজ নিতে তিন কিলোমিটার দূরের স্টেশনে গেলে লোকে হাসবে। অথচ এই সামান্য প্রশ্নটা চামড়ার তলায় লুকিয়ে ফুটে থাকা কাঁটার মত খচখচ করতেই থাকে।

একসময় অরূপ পশ্চিমের জানলা থেকে সরে আসে। এক গ্লাস জল খেয়ে পুবের দেওয়ালের দিকে এগিয়ে যায় আলোর সুইচটা বন্ধ করতে। ঠিক তখনই পশ্চিমের দরজায় টোকা মারার শব্দ হয়। অরূপ বিশাল-বক্ষ মানুষ ভয়ডর তার নেই বললেই চলে। তবুও সে যেন একটু চমকে ওঠে এই অপ্রত্যাশিত আওয়াজে। ঘরের মাঝখানে থমকে দাঁড়ায়, গ্রাণ্ড ফাদার ক্লকের দিকে তাকায়—রাত বারোটা পঁয়ত্রিশ। আবার দরজায় টোকা মারার শব্দ হয়। অরূপ পশ্চিমের দরজার সাথে মুখ লাগিয়ে চাপা স্বরে প্রশ্ন করে, কে?

অরূপ যদি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে তবুও সে আওয়াজ অন্দরমহল পর্যন্ত পৌঁছবে কিনা সন্দেহ। রীতিমত গলা ছেড়ে কথা বললেও সে আওয়াজ দেউড়ির দারোয়ানদের কানে পৌঁছবে না। তবুও চাপা গলায় কথা বলার কারণ পাশের ঘরে শুয়ে আছে অরূপের খাস চাকর মোহন, যাকে অরূপ ব্যঙ্গ করে বলে, আমার বডিগার্ড। আসলে মোহন বেশ ভীতু ছেলে। এত রাতে বাইরের দরজায় কেউ এসেছে জানতে পারলে, ভয়ে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে। তাই অরূপ চাপা স্বরে প্রশ্ন করে, কে? যাতে পাশের ঘরে অঘোরে ঘুমিয়ে থাকা মোহনের কান পর্যন্ত আওয়াজ না পৌঁছয়। কিন্তু অরূপের প্রশ্নের কোন উত্তর আসে না, বদলে আবার দরজায় টোকা পড়ে। অরূপ আবার প্রশ্ন করে, কে? এবার উত্তর পায় এবং উত্তর পেয়ে অরূপ চমকে ওঠে। এক মিষ্টি প্রমিলা কণ্ঠে অনুরোধ ভেসে আসে, দয়া করে দরজাটা একটু খুলবেন?

অরূপের চোখ আরো একবার গ্রাণ্ডফাদার ক্লকের দিকে চলে যায় তারপর বিস্ময়ে হতবাক চোখ ফিরে আসে দরজার ওপর। যেন দরজা ভেদ করে ওপারের মানুষটাকে দেখতে চায়-বুঝতে চায় তার অভিসন্ধি। মাথার মধ্যে কিলবিল করে ওঠে এক ঝাঁক প্রশ্ন কে ঐ ভদ্রমহিলা? কী তার উদ্দেশ্য? তাকে কি কোন বিপদে ফেলতে চায়? কীভাবে? বাইরে থেকে আবার কাতর অনুরোধ আসে, দরজাটা দয়া করে একবার খুলুন না।

অরূপ সিদ্ধান্তে আসে দরজা খুলে দেখাই যাক না কী হয়। তাকে বিপদে ফেলা খুব একটা সহজ কাজ নয় বলেই অরূপের বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসে ভর করে অরূপ ভারী হুড়কোটা খুলে পেতলের বালাটা ধরে টান দেয়। ঠিক সেই সময়ে ঘরের বিজলী বাতিটা বিনা ভূমিকায় নিভে যায়। লোডসেডিং। কদিন ধরেই রাত সাড়ে বারোটার পর ঘন্টা দেড়েক লোডশেডিং হচ্ছে, ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই আলো নিভে যাওয়া যেন অন্যমাত্রা এনে দেয়। দরজার ভারি পাল্লাটা কোঁ-ওঁ-ওঁ-কট কট শব্দ করে খুলে যায়। বাইরে ঘরের মত জমাট বাঁধা অন্ধকার নেই, তারার আলোয় বেশ বোঝা যায় সামনে এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। অরূপ তাকে উদ্দেশ্য করে বলে, একমিনিট দাঁড়ান আমি বাতিটা জ্বালিয়ে নিই। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে অরূপ বাতি দেশলাই যোগাড় করে বাতি জ্বালায়। দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকে, আসুন, ভিতরে আসুন। ভদ্রমহিলা ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করে। অরূপ সরাসরি তার মুখের দিকে তাকায়, দেখে মেয়েটাও একদৃষ্টে তারদিকেই তাকিয়ে আছে। মেয়েদের বয়স বোঝা শক্ত তবুও মনে হয় কতইবা বয়স হবে সাতেরো-আঠেরো কিম্বা আরো কম। স্লিমফিগার, চোখ বড় বড় নাক টিকলো গায়ের রং বেশ ফর্সা— যাকে বলে শাখারা সুন্দরী মেয়েটা তাই। মেয়েটার মুখে হাসির আভাস খেলে গেল, দুগালে টোল পড়ল। মেয়েটা কুণ্ঠিতভাবে বলল, অসময়ে বিরক্ত করলাম।

— না না তেমন কিছু না। আমিতো জেগে ছিলাম। কিন্তু —

— জানি আপনার মনে অনেক প্রশ্ন জেগেছে। সব প্রশ্নের উত্তর দেব, কিন্তু তার আগে আমায় এক গ্লাস জল খাওয়াবেন?

— নিশ্চই।

অরূপ এক গ্লাস খাবার জল এগিয়ে দেয় মেয়েটার দিকে। জলের গ্লাসটা এক নিশ্বাসে শেষ করে মেয়েটা আবার একটু হেসে বলে, বড্ড পিপাসা পেয়েছিল তাই আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করলাম। আসলে আশপাশের কোন বাড়িতেই আলো জ্বলছিল না তো তাই আপনার ঘরে আলো জ্বলতে দেখে—

— তাতো বুঝলাম, কিন্তু এতো রাতে একা—

— আসলে লাস্ট ট্রেনে ফিরছিলাম হঠাৎ ট্রেনটা মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়ল, সবাই বলল ট্রেন খারাপ হয়ে গেছে আর যাবে না। আমাদের কামরায় যে দু'তিনজন লোক ছিল তারা লাফিয়ে নেমে পড়ল দেখে আমিও নেমে পড়লাম। তারপর শোনা গেল ট্রেন ছাড়বে। সবাই লাফিয়ে ঝুলে উঠে পড়ল কিন্তু আমি উঠতে পারলাম না। আমায় নিচে রেখে গাড়ি ছেড়ে চলে গেল। একা পড়ে রইলাম মাঠের মধ্যিখানে। কী করব, বাধ্য হয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। ভয়ে উত্তেজনায় গলা শুকিয়ে উঠলো।

— বোঝাগেল ব্যাপারটা। আপনার বাড়ি কোথায়?

— আমার বাড়ী লক্ষ্মীপুর। কিন্তু আমায় আপনি আপনি করে বলবেন না আমার লজ্জা করে। আমি আপনার থেকে অনেক ছোট।

অনেক না হলেও মেয়েটা যে অরূপের থেকে বয়সে ছোট এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, তাই কোন ভনিতায় না গিয়ে অরূপ সরাসরি আপনি থেকে তুমিতে নেমে আসে, প্রশ্ন করে, লক্ষ্মীপুর তো অনেক দূর এতো রাত্রে যাবে কী করে?

— সে আমি ঠিক চলে যাব, কোন অসুবিধে হবে না।

— না, তা হয় না। আমি অন্দরমহলে খবর দিচ্ছি। মা, তোমার খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। কাল সকালে বাড়ি যাবে।

মেয়েটা চমকে ওঠে, না না অমন কাজ করবেন না। আমার পরিচয় পেলে আপনার বাবা মা খুব রেগে যাবেন। আপনি কথা দিন আমার আসার কথা কাউকে বলবেন না। কাউকে নয়।

মেয়েটার কাতর মুখ দেখে অরূপের মন আর্দ্র হয়। সে বলে, আচ্ছা আচ্ছা না হয় কারোকে কিছু নাই বললাম। কিন্তু আমি কি জানতে পারি তোমার পরিচয়?

— আমি লক্ষ্মীপুর জমিদার বাড়ির মেয়ে, আমার নাম মধুছন্দা। আপনাদের পরিবারের সাথে আমাদের পরিবারের একসময় খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল। কয়েক বছর আগে শুরু হয় দুই পরিবারের মনমালিন্য। আগে

সম্পর্কটা যত মধুর ছিল ততটাই তেতো হয়ে যায়। তাই, আমি এবাড়ি এসেছি শুনলে আমার বাবা-মাও খুশি হবেন না আর আপনার বাবা-মাও আনন্দিত হবেন না। তাই বলছিলাম আমার আসার কথা দয়া করে কাউকে বলবেন না।

মধুছন্দা অরূপের পড়ার টেবিল থেকে একটা বই তুলে মোমবাতির আলোর সামনে মেলে ধরে। উচ্ছল কণ্ঠে বলে, আপনি ইতিহাসের ছাত্র? জানেন ইতিহাস না আমার ভীষণ প্রিয় বিষয়। ইতিহাস পড়তে পড়তে আমার মনে হয় যেন হাজার বছর আগের মানুষজন, রাজা-মহারাজা আমার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হয় ইচ্ছে করলেই তাদের সাথে কথা বলতে পারব!

— বাঃ! তুমি তো দারুণ কথা বলতে পার।

— নানা এ শুধু কথার কথা নয়। এ আমার নিজস্ব উপলব্ধি। বিশ্বাস করুন। খানিক চুপ করে থেকে মধুছন্দা আবার বলে, আমি যদি মাঝে মাঝে আপনার সাথে ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে আসি, আপনি কি রাগ করবেন?

এবার অরূপ হেসে ফেলে। বলে, এইমাত্র বললে তোমার এবাড়িতে আসা দুই পরিবারের কেউই ভালো চোখে দেখবে না, আবার বলছ মাঝে মাঝেই আসবে?

— এতে হাসির কী আছে?

— আজ তোমার আসার কথা নাহয় কারোকে বললাম না। কিন্তু এরপর যখন তুমি দিনের বেলায় আসবে, তখন তো সবাই দেখতে পাবে।

— কে বলেছে আমি দিনের বেলা আসব? আমি এরকম রাত্রিবেলাতেই আসব। আপনারও পড়ার ব্যাঘাত হবে না, আর পৃথিবীর তৃতীয় কেউ জানতেও পারবে না আমার আসার কথা।

— তোমার সাহস তো খুব। আজ নাহয় ঘটনাচক্রে মাঝরাতে এসেছো, আবার মাঝরাতে সখ করে মাঝে মাঝেই আসতে চাও?

বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত এক টুকরো হাসির রেখা খেলে গেল মধুছন্দার গোলাপী পাতলা ঠোঁট ছুঁয়ে। মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে বলল, আমার জন্যে

আপনি যত চিন্তা করছেন অত চিন্তা না করলেও চলবে। শুধু বলুন আপনার কোন আপত্তি নেই তো?

অরুপ এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলে, আমার পড়ার সময় বাদ দিয়ে অন্যসময় যদি আসো আমার কোন আপত্তি নেই।

মধুছন্দা বলেছিল বটে মাঝে মাঝে আসবে কিন্তু পরদিন থেকে নিয়মিত আসতে শুরু করে। ঠিক লাস্ট ট্রেনটা মাঠ পেরিয়ে চলে যাবে অমনি দরজায় তিনটে টোকা পড়বে ঠক ঠক ঠক। তৃতীয় দিন থেকে অরূপও যেন উদগ্রীব হয়ে পড়ে দরজায় ঠক ঠক ঠক আওয়াজ শোনার জন্য। আসলে সারা দিনরাত পড়ার মধ্যে ডুবে থাকার পর আধঘন্টা মধুছন্দার সাথে গল্প গুজব করে মনটা বেশ চাঙ্গা হয়ে যায়। ওর সাথে কথা বলে অরূপ বেশ আনন্দ পায়। বেশ যুক্তি দিয়ে কথা বলে মেয়েটা। সব জিনিস ও ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারে। ওর যুক্তির জালে অনেকক্ষেত্রেই ইতিহাসের চরিত্রগুলোর রূপ বদলে যায়। অথচ ওর যুক্তিগুলোও কিন্তু উড়িয়ে দেয়ার মত নয়। অরূপের মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে তবে কি বইয়ের পাতায় যে ইতিহাস লেখা রয়েছে তার মধ্যেও ফাঁক রয়ে গেছে? নতুন কোন প্রত্ন-আবিস্কার বদলে দেবে পরিচিত ইতিহাস কে? কে জানে!

৫

অরূপ কলকাতা থেকে দেশে এসেছে মাত্র কুড়ি দিন হয়েছে। এই অল্পদিনেই তার চেহারাটা বেশ ভেঙে গেছে। চোখের কোণে কালি পড়েছে, মুখটা শুকিয়ে গেছে। ব্যাপারটা প্রথম চোখে পড়ে অরূপের মায়ের। তিনি উদয়বাবুকে কথাটা বলতে, উদয়বাবু প্রথমে ততটা গুরুত্ব দেননি, ভেবেছিলেন পড়াশোনার চাপে হয়তো অমন শুকিয়ে গেছে ছেলেটা। কিন্তু কুড়ি দিনের মাথায় সকালবেলা যখন অরূপ বাথরুমে মাথা ঘুরে পড়ে গেল তখন উদয়বাবু বিচলিত হয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ল পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার দত্তর।

ডাক্তার দত্ত এলেন, অরূপকে দেখলেন, কিন্তু কোন রোগের লক্ষণ খুঁজে পেলেন না। অথচ অমন লম্বা চওড়া সুন্দর দেহটার মধ্যে, রক্ত যেন

নেই বলে মনে হল। ডাক্তার দত্ত কতকগুলো রক্ত পরীক্ষার পরামর্শ দিয়ে আয়রন টনিক ভিটামিনের প্রেসকিপসান করে চিন্তিতভাবে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে রোগের জটিলতার কথা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

দুপুরে খেয়েদেয়ে অন্দরমহলের একটা ঘরে শুয়েছিল অরূপ। মা ঘরে ঢোকেন—অরূপ উঠে বসতে যায়। মা ধমক লাগান, উঠছিস কেন চুপ করে শুয়ে থাক। তারপর এসে বসেন অরূপের পাশে। মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলেন, কী অসুখ বাঁধিয়ে বসলি· বল দেখি, দত্ত ডাক্তারের মত পোড় খাওয়া ডাক্তারও রোগ ধরতে পারছে না!

অরূপ ম্লান হেসে বলে, আমিও তো তাই ভাবছি মা। আমার এই শরীরটার জন্য আমার গর্ব ছিল। আমার ধারণা ছিল ব্যায়ামপুষ্ট আমার দেহ নীরোগ, নির্মল সুন্দর—সেখানে যে হঠাৎ এমন রোগ ঢুকে পড়বে এতো আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

— খুব রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করতিস বুঝি?

— না মা, লাষ্ট ট্রেন যাওয়ার পরেই —

অরূপ হঠাৎ মাঝপথে থেমে যেতে তার মা বিচলিত হয়ে প্রশ্ন করেন, কি হল বাবা? চুপ করে গেলি যে?

— না, মানে বলছিলাম লাষ্ট ট্রেন যাওয়ার আগেই বইখাতা গুছিয়ে ফেলতাম। তারপর —

অরূপের মা অসীম আগ্রহে প্রশ্ন করেন, তারপর কী?

অরূপ নিজের মনের দ্বন্দ্বে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকে। একবার মনে হয় মধুছন্দার কথাটা মায়ের কাছে বলে দেওয়া উচিত কারণ সে ছোট থেকে কোনদিন কোন কথা মায়ের কাছে গোপন করেনি এখনও করবে না। আর কথাবার্তা এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে এখন মধুছন্দার কথা গোপন করতে গেলে তাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে যা তার দ্বারা হবে না। আবার মনে হয় মধুছন্দার কাছে সে প্রতিজ্ঞা করেছে—মধুছন্দার আসার কথা কারোকে বলবে না। এখন মাকে তার কথা বলে দিলে সে তো মধুছন্দার কাছে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। অরূপের মনের দ্বন্দ্বের ছাপ পড়ে তার

মুখে। তার মা ছেলের মুখ দেখে বুঝতে পারেন সে কোন কথা গোপন করতে চাইছে। ছেলের হাতটা দু'হাতে চেপে ধরে কাতর স্বরে বলেন, দোহাই খোকা, আমি তোর মা, আমার কাছে কোন কথা গোপন করিস নে। বল —

অরূপের মনের দ্বন্দ্ব ঘুচে যায়। না মায়ের কাছে কোন্ কথা গোপন করবে না। সে মায়ের কোলের কাছে সরে এসে বলে, মা আমি যা বলব তুমি বাবাকে বলে দেবে না তো?

— আচ্ছা সে দেখা যাবে, আগে বলত শুনি।

— রোজ লাস্ট ট্রেন চলে যাওয়ার পর মধুছন্দা নামে একটা মেয়ে আসে আমার কাছে।

অরূপের মায়ের মুখটায় একটু রাঙা আভা খেলে যায়, চোয়ালটা শক্ত হয়। কিন্তু তা ক্ষণেক মাত্র, পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করেন, কে মধুছন্দা? কোথায় বাড়ি?

অরূপ আবার সাবধান করে, তুমি বাবাকে কিছু বলবে না তো? একটু থেমে বলে, মধুছন্দা লক্ষ্মীপুর জমিদার বাড়ির মেয়ে।

— তুই কি মেয়েটাকে চিনতিস আগে থেকে?

মায়ের ভয়ে কম্পিত কণ্ঠ শুনে অরূপ ঘাবড়ে যায়। নতুন করে ভাবতে শুরু করে মধুছন্দার কথা মাকে বলা ঠিক হল কিনা? মা কী ভাবছে? বাবা শুনলে কী ভাববে? সে মায়ের পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, বিশ্বাস করো মা, আমি মেয়েটাকে আগে চিনতাম না। বাবা যে কখনো, ওকে এবাড়ির বৌ করে আনবে কথা দিয়েছিলেন তাও জানতাম না।

অরূপের মায়ের ভ্রু কুঁচকে আবার সোজা হয়ে যায় বোঝা যায় এই বাকদানের খবর তার কাছেও অজানা ছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করেন, কবে থেকে আসছে মেয়েটা?

— আমি বার-মহলে থাকতে শুরু করার তিন চারদিন পর থেকে। মানে প্রায় দিন পনেরো আগে থেকে।

— কেন আসে মেয়েটা রোজ রোজ?

— আসলে ইতিহাস ওর খুব প্রিয় বিষয়। আমার সাথে ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে আসে। জান মা, মেয়েটার না ইতিহাসে অদ্ভুত দখল, ও ইতিহাসের ঘটনাগুলো এমনভাবে ব্যাখ্যা করে যে প্রচলিত ধারণা বদলে যায়। এই তো কাল রাত্রে মহারাজ অশোকের সময়ের সমাজব্যবস্থা নিয়ে কথা হচ্ছিল —

অরূপের মা মাঝপথে বাধা দিয়ে বলেন, তোমাদের ইতিহাসের পড়া আমি বুঝব না, ও কথা থাক। মেয়েটার সঙ্গে যে তোমার বিয়ের কথা হয়েছিল একথা তুমি জানলে কার কাছে?

— মধুছন্দাই একদিন কথায় কথায় বলছিল, এই যে আমি রোজ রোজ তোমার কাছে আসছি, তুমি হয়তো ভাবছ মেয়েটা কেমন রে বাবা। ভয় ডর নেই, লাজলজ্জা নেই — কি এই সব ভাবছ তো? আমি কোন উত্তর না দিয়ে শুধু একটু হেসেছিলাম। তখন সে বেশ দার্শনিকভাবে বলেছিল, তোমার ঘরে আসার আমার অধিকার আছে। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, কিরকম? তখন ও যা বলেছিল তার সারমর্ম এই, বছর দশেক আগে যখন দুই পরিবারে হৃদ্যতা ছিল, তখন একদিন বাবা মধুছন্দাকে দেখে ওর বাবাকে বলেছিল, বাঃ তোমার মেয়ে তো লক্ষ্মী প্রতিমার মত হয়েছে, একে আমার ঘরের লক্ষ্মী করে নিয়ে যাব। মধুছন্দার বাবা প্রশ্ন করেছিলেন, সত্যি বলছেন দাদা? উত্তরে বাবা বলেছিলেন, রাজা উদয় নারায়ণ এককথার মানুষ। আমি যখন বলেছি তখন যেন কথা পাক্কা। মধুছন্দা বলেছিল সেই থেকে তোমাকে আমি মনে প্রাণে গ্রহণ করেছি। কত স্বপ্ন দেখেছি, কত ছবি এঁকেছি। তারপর কী যে হল দুই পরিবারে বিরোধ বাধল। মামলা মকদ্দমা, কোর্ট কাছারি পর্যন্ত গড়াল সে বিরোধ। যত হৃদ্যতা ছিল শত্রুতা দাঁড়াল তার শতগুণ। রাজা সাহেবের পাক্কা কথা সেই অশান্তির স্রোতে কোথায় যে ভেসে গেল কে জানে? আমার মনের মধ্যে কিন্তু রয়ে গেলে তুমি। চারবছর বাদে তুমি দেশে ফিরলে। তোমায় দূর থেকে একটু দেখার লোভে রেল স্টেশনে গেলাম। দুচোখ ভরে তোমায় দেখলাম। আহাঃ কী রূপ! রাজকুমার তো রাজকুমার। কিন্তু আমার বাবা কী করে যেন খবরটা জেনে গেলেন। আমায় কিছু বললেন

না, গুম হয়ে গেলেন। যদি বকতেন বা রাগারাগি করতেন তবে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। গুমটআকাশের পর এক পশলা বৃষ্টি যেমন পরিবেশকে স্বাভাবিক করে তোলে, তেমনই পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে যেত। কিন্তু তা হল না। পরিবেশটা গুমট হয়েই রইল। আমি ভয়ে ভয়ে রইলাম, কখন কোন দিক থেকে কীরকম আঘাত আসবে কে জানে? শেষপর্যন্ত আঘাতের স্বরূপ আমি জানতে পারলাম। বাবা কোমর বেঁধে লেগেছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার বিয়ে দিয়ে দেয়ার জন্য। শুনে আমি জীবনে প্রথম বাবার মুখোমুখি দাঁড়ালাম। তাঁর চোখে চোখ রেখে প্রতিবাদ করলাম, আমি বিয়ে করব না।

— কেন?

— ছোটবেলা থেকে তোমাদের মুখেই শুনেছি অরূপবাবুর সাথে আমার বিয়ে হবে। মনে প্রাণে সেটাই সত্যি জেনেছি। এখন অন্য কাউকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

— এখন তো তুমি আর ছোট নও নিশ্চই বুঝতে পার অরূপের সাথে তোমার বিয়ে হওয়া আর সম্ভব নয়।

— পারি, বুঝতে পারি। আর পারি বলেই তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি অন্য কাউকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় কারণ মানসিকভাবে আমি বিবাহিত। আমি আর বিয়ে করব না।

মধুছন্দার বাবা সব শুনে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলেছিলেন, আচ্ছা সে দেখা যাবে।

অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে কথা বলে অরূপ চুপ করে। অরূপের মা প্রশ্ন করেন, আর কী বলেছে মধুছন্দা?

— ও প্রায়ই বলে, জানি এ জীবনে তোমাকে পাব না, কিন্তু তাতে আমার দাবী এতটুকুও কমবে না। জন্ম জন্মান্তরে তোমাকে নিশ্চই পাব। আমি জন্ম জন্মান্তর অপেক্ষা করে থাকব। আবার মাঝে মাঝে নিজের মনেই বলত, কটা দিন অপেক্ষা করো না তোমার আমার মাঝের সব বাধা দূর হয়ে যাবে।

অরূপের মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ান। অরূপ পেছন থেকে মায়ের আঁচল টেনে ধরে। মা ফিরে দাঁড়ালে মায়ের ডান হাতটা নিজের দুহাতের

মধ্যে নিয়ে কাতর স্বরে বলে, দোহাই মাগো বাবাকে যেন মধুছন্দার কথা বোলো না। বাবা তাহলে বড্ড রেগে যাবে, খুব দুঃখ পাবে। বিশ্বাস করো, মধুছন্দার ব্যাপারে দশবছর আগে কী কথা হয়েছিল আমি জানতাম না। এমন কি এর আগে ওকে কোনদিন দেখেছি বলেও মনে পড়ে না। একটু থেমে অরূপ আবার কাতর স্বরে বলে, বাবাকে বলবে না তো?

অরূপের মা চিন্তিত মুখে বলেন, তোমার যা শরীরের অবস্থা এ সময় বোধহয় কোন কথা গোপন করা উচিত নয়। তোমার বাবা বিচক্ষণ মানুষ তাঁর ওপর ভরসা রাখো, তিনি নিশ্চই অকারণ রাগ দুঃখ করবেন না।

৬

ডাক্তার দত্তর প্রেসক্রিপসান মত রক্ত পরীক্ষা কলকাতার নামী ল্যাবরেটারী থেকে করে বিকেলের মধ্যে তার রিপোর্ট পৌঁছে গেল। রিপোর্ট দেখে ডাক্তার দত্ত তাঁর গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর করে ঘাড় ঝাঁকালেন। উদয় নারায়ণ ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে সভয়ে প্রশ্ন করলেন, কোন কঠিন অসুখ নাকি ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার দত্ত আবার ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলেন, রক্তের রিপোর্টে কোন রোগের লক্ষণ তো দূরে থাক এতটুকু অসঙ্গতি নেই। তাহলে আমার প্রশ্ন এমন অস্বাভাবিক রক্তাল্পতা হল কী করে?

উদয় নারায়ণ মন্ত্রচ্চারনের মতে বলেন, কী করে হল?

— আমি জানি না। এ আমার ডাক্তারি বিদ্যের বাইরে। আমার মনে হয় অরূপকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতায় নিয়ে গিয়ে পুরো বডি চেক-আপ করানো দরকার। কিন্তু ওর যা শরীরের অবস্থা, এতটা জার্নির ধকল নিতে পারবে না। আমি কিছু টনিক দিয়ে যাচ্ছি, একটা ফুড লিস্ট করে দিয়ে যাচ্ছি। দিন দুয়েকের মধ্যে আশা করি একটু ইমপ্রুভমেন্ট হবে। তখন কলকাতা নিয়ে চলে যাবেন।

ডাক্তারবাবু চলে গেছেন, সারা বাড়ি থমথম করছে। উদয় নারায়ণ চিন্তিত মুখে অন্দর মহলের লম্বা বারান্দায় পায়চারি করছেন। অরূপের মা অনেক দ্বিধা সংকোচ কাটিয়ে শেষে মনস্থির করেই ফেলেন। উদয় নারায়ণের

সামনে এসে দাঁড়ান। প্রশ্ন করেন, লক্ষ্মীপুরের জমিদারের মেয়েকে কি তুমি ঘরের বৌ করে আনবে কথা দিয়েছিলে?

উদয় নারায়ণ মাছি তাড়ানোর ভঙ্গীতে হাত নেড়ে বলেন, যখন কথা দিয়েছিলাম তখন ওরা আমাদের মান্য করে চলত। এখন নতুন করে সে কথা উঠছে কেন?

— মেয়েটা নাকি গত পনেরোদিন রোজ খোকার কাছে আসে —

উদয় নারায়নের পায়চারি থেমে যায় অরূপের মায়ের একেবারে সামনে এসে বিস্ময়বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, কী বললে? সেই মেয়েটা—গত পনেরো দিন—অরূপের কাছে?

— হ্যাঁ, মাঝরাতে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে —

— অরূপ কি মেয়েটাকে চিনত?

— না মেয়েটাই নিজের পরিচয় দিয়েছে, সব ঘটনা বলেছে। এও বলেছে এজীবনে যদি অরূপকে না পায়, জন্ম জন্মান্তর সে অরূপের জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে।

উদয় নারায়ণ বিচলিত কণ্ঠে ডাক দেন, এই কে আছিস —

একটা চাকর এসে দাঁড়াতেই উদয় নারায়ণ ব্যস্তভাবে বলেন, তাড়াতাড়ি যা, ঠাকুরমশাইকে খবর দে। বলবি আজ সন্ধ্যের মধ্যেই আমার বাড়িতে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করতে হবে। সবকিছু যোগাড় করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন উনি চলে আসেন। যা বাবা যা, তাড়াতাড়ি যা।

অরূপের মা শান্ত স্বভাব স্বামীর বিচলিত ভাব দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। কাতর স্বরে প্রশ্ন করেন, তুমি এত বিচলিত হচ্ছ কেন? কী হয়েছে আমায় খুলে বল না।

উদয় নারায়ণ অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন, স্ত্রীর প্রশ্নে তার মুখোমুখি এসে দাঁড়ান। অসহায় কণ্ঠে বলেন, বিচলিত হব না! বলে কিনা জন্ম জন্মান্তর অরূপের জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে, আমি বিচলিত হব না?

— মেয়ে মানুষ তো অমন কথা বলেই থাকে, তাতে এতো বিচলিত হওয়ার কী আছে?

উদয়নারায়ণ বাঁ হাতের তালুতে ডান হাত দিয়ে ঘুসি মেরে বলেন, কী বলছ তুমি, বিচলিত হব না? তুমি মধুছন্দার বিষয়ে বোধহয় কোন কথাই জাননা?

— কী কথা? কৈ আমি কিছু জানি না তো!

— মধুছন্দার বাবা মেয়ের বিয়ের ঠিক করেছিল। বোধহয় মেয়ের অমতেই। পাকা দেখার আগের রাত্রে—সে ঐ দিন পনেরো আগেই হবে —মেয়েটা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পরদিন তার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল ঐ পশ্চিমের মাঠে রেল লাইনে। লাষ্ট ট্রেনে কাটা পড়ে —

উদয়নারায়ণের কথা শেষ হয় না তার সামনেই তার স্ত্রীর অচৈতন্য দেহটা লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে তাকে শুশ্রূষা করতে।

৭

রাজ পুরোহিত পৌঁছলেন সন্ধ্যে হওয়ার আগেই। সমস্ত বৃত্যান্ত শুনলেন উদয়নারায়ণের কাঁছে। শুনে, বেশ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। শেষে মুখ তুলে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন উদয়নারায়ণের দিকে। বললেন, রাজাবাবু, আপনি যদি আজ্ঞা করেন আমি এখনই শান্তি স্বস্তায়ণ শুরু করতে পারি। যদি অনুমতি করেন, বাড়ি বেঁধে দিয়ে যাব কোন অশুভ আত্মা এবাড়িতে প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু সে ক'দিন? একদিন, দুদিন, বড়জোর তিনদিন, তারপর? বাড়ি বন্ধন তো অনন্তকালের জন্যে করা যায় না। তাছাড়া কুমারকেই বা আপনি কতদিন ঘরের মধ্যে আটকে রাখবেন? সে পুরুষমানুষ তাকে বাড়ির বাইরে বার হতেই হবে। লক্ষণের গণ্ডী কেটে চিরকাল তো তার মধ্যে কুমারকে আটকে রাখতে পারবেন না।

উদয়নারায়ণ চিন্তিত মুখে ঘাড় নেড়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ঠাকুরমশায়ের দিকে তাকান। বলেন, আপনি কী পরামর্শ দেন?

আবার কিছু সময় পুরোহিত মশাই মুখ নিচু করে চুপচাপ বসে থাকেন তারপর মুখ তুলে প্রশ্ন করেন, আমার পরামর্শ শুনবেন?

— বলুন।

— পনেরো দিন তো আপনাদের অজান্তে কুমার প্রেতিনীর সাথে সময় কাটিয়েছে। আজ রাত্রে আর একবার, শেষবারের মত তাকে প্রেতিনীর সঙ্গে মিলিত হতে দিন।

— আপনি কী বলছেন ঠাকুরমশাই! জেনে শুনে...

— হ্যাঁ জেনে শুনে এই একটা দিন কুমারকে প্রেতিনীর কাছে পাঠাতে চাইছি সারাজীবনের মত নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে। ভেবে দেখুন রাজাবাবু। আরো বলে রাখি আমি সবসময় কুমারকে সাহায্য করার জন্যে তার কাছে কাছেই থাকব।

উদয় নারায়ণ কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকেন, শেষে মাথা তুলে বলেন, দেখুন আপনি যা ভালো বোঝেন তাই করুন। সবই দেবাদিদেবের ইচ্ছে আর আপনার আশীর্বাদ। জয় বাবা ভূতনাথ। নমঃ শিবায়ঃ। উদয়নারায়ণ দুহাত জড়ো করে কপালে ধরে থাকেন। তার দুচোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে। ঠাকুরমশাই এগিয়ে এসে তাঁর মাথায় হাত রাখেন। বলেন, আমার ওপর আপনি ভরসা রাখুন রাজাবাবু। উদয়নারায়ণ তাঁর দুপায়ে হাত রেখে ডুকরে কেঁদে ওঠেন, আমার অরূপকে আপনি বাঁচান ঠাকুরমশাই।

— রাজাবাবু শান্ত হোন। আবার বলছি, আমার ওপর ভরসা রাখুন। কয়েকটা কথা বলি মন দিয়ে শুনুন। আপনি, রাণি মা যে কথা জেনেছেন তা পাঁচকান যেন না হয়। অন্তত আজ রাতটা। কারণ বার মহলের দিকে কেউ আড়ি পাতলে রাজকুমারের ক্ষতি হতে পারে। রাজকুমারও যেন কোন কথা জানতে না পারে। আর বারমহলে রাজকুমারের পাশের ঘরটায় একটা কম্বল পেতে রাখবেন, আমি বার মহলের বড় দরজা বন্ধ হওয়ার আগেই ওখানে পৌঁছে যাব। একটু থেমে বলেন, যাই একবার রাজকুমারের সাথে দেখা করে আসি।

৮

কুলপুরহিতকে ঘরে ঢুকতে দেখে অরূপ তাড়াতাড়ি উঠে বসে বিছানা থেকে নেমে এসে প্রণাম করে। ঠাকুরমশাই হাত তুলে আশীর্বাদের

ভঙ্গীতে বলেন, থাক বাবা থাক, আয়ুষ্মান হও, দীর্ঘজীবী হও। শুনলাম তোমার শরীর খারাপ তাই একবার দেখা করতে এলাম। এখন কেমন আছো?

— এখন বেশ সুস্থই আছি। বুঝতেই পারছি না সকালবেলা হঠাৎ অমন মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম কী করে।

— অমন মাঝেমধ্যে হতেই পারে। শরীর তো আর যন্ত্র নয় যে রোজ এক নিয়মে চলবে। যাক ওসব কথা, এগজামিনের পড়াশোনা কেমন হচ্ছে তাই বল। আমরা সবাই কিন্তু আশা করে আছি তুমি আমাদের গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করবে। কি বাবা পারবে তো?

— চেষ্টা করব।

— বেশ বাবা বেশ। তা তুমি শুনেছি কলেজে নাকি থিয়েটারে অভিনয় করো? পরীক্ষার পর গ্রামেও এক আধটা নাটক নভেল করো না, আমরাও একটু দেখি। অরূপ মাথা নিচু করে বলে, পরীক্ষার পর দেখি কী করা যায়।

— তা বেশ, পরের কথা পরে ভাবা যাবে। এখন বরং যে কারণে এসেছি সেই কথা বলি। প্রথমেই বলে রাখি বাবা, আজ শুধু আমি যা যা বলব মন দিয়ে শুনবে আর তাই করবে। আজ কোন প্রশ্ন করবে না। যা প্রশ্ন করার কাল করবে আমি সব প্রশ্নের জবাব দেব।

— আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না ঠাকুরমশাই। আপনি কী বলবেন, আমি কী করব, কেন করব?

— উহুঁ, আজ কোন প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন সব কালকে। আজ যা বলি শোন।

— বলুন।

— আজ তোমায় একটু অভিনয় করতে হবে।

— অভিনয়! কোথায়? কেন?

— আবার প্রশ্ন শুরু করলে?

— বেশ, আর প্রশ্ন করব না। আপনি বলুন কী করতে হবে।

— যখন রাত্রে মধুছন্দা আসবে—

অরূপ লজ্জায় মুখ নিচু করে বলে, মধুছন্দার কথা আপনি জানলেন কী করে? একটু সময় নিয়ে নিজেই উত্তর দেয়, মা বলেছে নিশ্চই। মায়ের পেটে না একটা কথাও থাকে না। বাবাকেও হয়তো বলে দিয়েছে। কী হবে এখন?

— শোন, মায়েরা যা করেন সন্তানের ভালোর জন্যেই করেন। যাক সে কথা, যা বলছিলাম, আজ রাতে মধুছন্দা এলে তোমায় একটু অভিনয় করতে হবে।

— কী রকম?

— মধুছন্দা যেই দরজায় টোকা দেবে অমনি দরজা খুলবে না। তার সাড়া নেবে, নিয়ে দরজা খুলে দিয়ে বলবে, একি তুমি আবার ফিরে এলে যে? এইতো পাঁচ মিনিট আগেই তুমি গেলে — এমনভাবে বলবে যাতে মধুছন্দার বিশ্বাস হয় কথাগুলো, বুঝতে পেরেছ?

— আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কেন মধুছন্দাকে মিথ্যে বলব? এ নিশ্চই বাবার কোন চাল —

— ছিঃ রাজকুমার! রাজাবাবুর সম্বন্ধে এমন ধারণা অন্তত তোমার কাছে আশা করিনি। এ রাজাবাবুর কথা নয়, এ আমার কথা আমার আদেশ। তুমি খুব ভালো করেই জানো আমি সর্বদা তোমাদের হিত চাই। তাই আজ রাতে তুমি কোন প্রশ্ন না করে শুধু আমার নির্দেশ পালন করবে। মনে রেখো রাজাবাবুও কোনদিন আমার আদেশ পালনে দ্বিরুক্তি করেন নি। আমি যেমন বললাম তুমি মধুছন্দাকে তেমনই বলবে। আজ আমি দেখতে চাই তোমার অভিনয় নৈপুণ্য। তারপর মধুছন্দা যা বলবে তুমি নির্ভয়ে তাই কোরো। জানবে আমি যা বলছি তোমার মঙ্গলের জন্যেই বলছি।

৯

রাত সাড়ে বারোটা বাজে। পশ্চিমের জানলা দিয়ে দেখা যায় লাস্ট ট্রেন মাঠ পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। অরূপ বিছানায় বসে অপেক্ষা করে অতি পরিচিত তিনটে টোকা পড়ার। তার মনের মধ্যে নানা ভাবনা তোলপাড়

গাছে চড়ায় অরূপ ছোট থেকেই ওস্তাদ। তার স্কুল জীবনের গরমের ছুটির দুপুরগুলো আমগাছের ডালে ডালেই কেটে যেত। এইতো গত বছর গরমের ছুটিতে বাড়ি ফিরেও গাছে চড়ে নিজের হাতে আম পেড়ে খেয়েছে। গাছে চড়তে অরূপকে তাই বিশেষ বেগ পেতে হয় না। সে গাছে উঠতে থাকে আর মধুছন্দা নিচে থেকে নির্দেশ দিতে থাকে—ওঠো, সোজা ওপর দিকের ডাল বেয়ে ওঠো—হ্যাঁ ঠিক আছে এবার ডানদিকের মোটা ডালটা ধরো—আরো উঠে যাও—এবার বাঁদিকে হেলা ডালটা ধরো, এগিয়ে যাও—আরো এগিয়ে যাও—এবার উঠে দাঁড়াও, মাথার কাছে যে ডালটা আড়াআড়ি চলে গেছে ঐ ডালের নিচের দিকে হাত বোলাও দেখ একটা ছোট্ট লতানে গাছ আছে—পেয়েছ? আর একটু বাঁদিকে - হ্যাঁ ঐ গাছটা শেকড় সমেত ছিড়ে নাও। নিয়েছ? এবার আস্তে আস্তে নেমে এসো। সাবধানে।

ওঠার সময় মধুছন্দার নির্দেশমত উঠতে অসুবিধে হয়নি। নামার সময় অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে নামতে অরূপ কাহিল হয়ে পড়ল। বহু কষ্টে নিচে নেমে সে অনেক দূর থেকে মধুছন্দার কথা শুনতে পেল। তার শেষ নির্দেশ শুনতে পেল, ঐ শেকড়টা কাছ ছাড়া করবে না। মাদুলি করে সবসময় পরে থাকবে। কোন অশুভ শক্তি তোমার কাছে আসতে পারবে না। শুধু রাত সাড়ে বারোটায় যখন লাস্ট ট্রেন চলে যাবে তখন ওঠাকে খুলে রেখো। আবার আমি চলে গেলেই পরে নিও।

অরূপের মনে হয় অনেকদূর থেকে মধুছন্দার কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে আসতে ক্ষীণ হতে হতে হারিয়ে যায়। অরূপের অচৈতন্য দেহটা গাছের গোড়ায় পড়ে থাকে।

১০

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। ঠাকুরমশাই আর অরূপের খাস চাকর মোহন বেশ খানিকটা দূর থেকে অরূপকে অনুসরণ করছিল তারা কিন্তু মধুছন্দাকে দেখতেও পায়নি তার গলার আওয়াজও শুনতে পায়নি। যখন অরূপ অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেল তখন দুজনে অরূপকে তুলে নিয়ে ফিরে

এলো বার মহলে। ঘড়িতে তখন আড়াইটে বেজে গেছে। মুখে জলের ঝাপটা দিতে অরূপের জ্ঞান ফিরল। অন্দরমহল থেকে ততক্ষণে গরম দুধের গ্লাস নিয়ে স্বয়ং রানিমা বার মহলে পৌঁছে গেছেন। দুধ খেয়ে অরূপ অনেকটা সুস্থ বোধ করে। ধীরে ধীরে সব ঘটনা বলে। ঠাকুরমশাই অরূপের হাত থেকে গাছের শেকড়টা নিয়ে উদয়নারায়ণের হাতে দিয়ে বলেন, একটা তাবিজের মধ্যে এই শেকড়টা ভরে রাজকুমারের হাতে পরিয়ে দিন। কখনো কোন কারণেই যেন এই তাবিজ হাত থেকে খুলবেন না বা খুলতে দেবেন না।

এতদিন ধরে মধুছন্দার প্রেতাত্মার সাথে মেলামেশা করেছে জানতে পেরে অরূপ ভয়ে বারমহলে শোয়াই ছেড়ে দিল। তবুও বেশ কিছুদিন রাত সাড়ে বারোটার পর শুনতে পেত অনেকদূর থেকে মধুছন্দার কণ্ঠস্বর ভেসে আসত, অরূপ তাবিজটা খুলে রাখো, আমি মধুছন্দা আমি এসেছি। অরূপ প্লিজ একবারটি তাবিজটা খোল।

অরূপ কানে বালিস চেপে ধরত, তবুও মধুছন্দার সকাতর অনুনয় সব কিছু ভেদ করে তার কান পর্যন্ত পৌঁছত - অরূপ আমি তোমার জন্যে সবকিছু হারিয়েছি তুমি আমাকে দূরে ঠেলে দিয়ে না। একটিবার তাবিজটা খোল, আমার অনেক কথা বলার আছে। অরূপ প্লিজ —

আবার কখনো শুনতে পেত দরজায় তিনটে টোকা পড়ছে। ঠক্ ঠক্ ঠক্ —

ছোটকাকা গল্প শেষ করে মিটিমিটি সবায়ের মুখের দিকে তাকায়। গল্পের আবেশ কাটতে বেশ কিছু সময় কেটে যায়। কে যেন খাটে ঠক্ ঠক্ ঠক্ করে তিনবার আওয়াজ করে। প্রায় সবাই চমকে ওঠে। সবার প্রথম কথা বলি আমি। ছোটকাকার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করি, পারসেন্টেজ কিরকম? ছোটকাকা সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বলে, সেন্ট পারসেন্ট। আমি আবার প্রশ্ন করি সেন্ট পারসেন্ট গুল, নাকি সেন্ট পারসেন্ট খাঁটি? ছোটকাকা হেঁয়ালী করে উত্তর দেন সেটা আপনাদের বিবেচ্য বিষয়।

নয় ভূতের গল্প ছয় ভূতের গল্প • সঞ্জয়কুমার মুখোপাধ্যায়

সুচেতনা

নয় ভূতের গল্প
ছয় ভূতের গল্প

সঞ্জয়কুমার মুখোপাধ্যায়

সঞ্জয়কুমার মুখোপাধ্যায়

জন্ম ২১ আগষ্ট ১৯৫৮ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গোচারণ গ্রামের পিতৃভূমিতে। পেশায় ভারতীয় রেলওয়ের সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার।

ছাত্র-জীবন থেকেই লেখালিখির শুরু। সেই সময় ছোট ছোট খাতায় হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করতেন বিপুল উৎসাহে। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের হাতে সারাবছর ধরে ঘুরে বেড়াতে সেই হাতে লেখা পত্রিকা। একসময় প্রায় স্থিমিত হয়ে আসা ভালোলাগাটাকে পুনরায় উসকে দেয় স্থানীয় অঞ্চল থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা 'সুচেতনা'। প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই যুক্ত হয়ে পড়েন সুচেতনার সঙ্গে, রচনা করতে থাকেন কবিতা ছড়া ছোটদের জন্য গল্প সাধারণ গল্প ভ্রমণকাহিনী এবং পরবর্তী সময়ে প্রবন্ধ। ছোটগল্প, ভ্রমণ কাহিনী এবং প্রবন্ধে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেন তিনি।

সুচেতনা ছাড়াও ইচ্ছেডানা, দেবযান, সাহিত্য মন্দির পত্রিকা, উজ্জয়নী, সন্ধিকালও পদক্ষেপ, সুধৃতি, ভোরাই, জ্যোতি রিঙ্গন, জাগোবাংলা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর রচনা। তাঁর কিশোর গল্প সংকলন একগুচ্ছ স্বপ্ন কুসুম ইতিমধ্যে পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে। সাহিত্য চর্চা ছাড়া ভালবাসেন গান করতে আর বছরে কমপক্ষে একবার সদলবলে বেড়াতে যেতে।